সিদীপ-এর শিক্ষা বিষয়ক বুলেটিন • আগস্ট-সেপ্টেম্বর ২০২৬

শিক্ষালোক

কোনো গাঁয়ে কোনো ঘর কেউ রবে না নিরক্ষর

অধ্যাপক আবুল কাসেম ফজলুল হক

সিদীপের সাধারণ পর্ষদের সদস্য

কৃষিবিজ্ঞানি

ড. এ.টি.এম. ফরিদের মৃত্যুতে

(৬ জানুয়ারি ১৯৫০ – ১৫ মে ২০২৬)

শোকাহত

সিদীপ ও শিক্ষালোক পরিবার

সিদীপ-এর শিক্ষা বিষয়ক বুলেটিন
ইমেইল: shikkhalokcdip@gmail.com, ফেসবুক: শিক্ষালোক বুলেটিন

প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক মোহাম্মদ ইয়াহিয়া

শিক্ষালোক

আগস্ট - সেপ্টেম্বর ২০২৬ ● ১৩শ বর্ষ ৩য় সংখ্যা

সূচি

শিক্ষা ও সরকার - আবুল কাসেম ফজলুল হক ২

শিশুর শিক্ষা অধিকার নিয়ে শিক্ষালোক বক্তৃতা ও আলোচনা ৫

মোহাম্মদ ইয়াহিয়া: অনুসরণীয় উন্নয়ন কর্মবীর - মো. জাহিদুল ইসলাম ৬

নতুন ফসল আবাদ (৪র্থ পর্ব) - প্রতাপ চন্দ্র রায় ও ফজলুল বারি ৭

অভিযোগের কাঠগড়ায় শিক্ষক, বিচারকের ভূমিকায় শিক্ষার্থী - মনিরুল ইসলাম শ্রাবণ ১৬

প্রতিটি টাকার গল্প - মো. মামুন ১৮

মোহমায়া - কাজী মাজহারুল ইসলাম রাসেল ২০

মুক্তপাঠাগার বইমেলা - মাহফুজুল মিথুন ২২

স্ক্যাবিস - ডা. এ. কে. এম. আব্দুল কাইউম ২৪

"কালের যাত্রার ধ্বনি" রাজনীতি ও সাংস্কৃতিক রূপান্তরের কথা - শিশির মল্লিক ২৭

প্রধান সম্পাদক
মিফতা নাঈম হুদা

সম্পাদক
ফজলুল বারি

নির্বাহী সম্পাদক
আলমগীর খান

প্রচ্ছদ শিল্পী
আদনান অভি

ডিজাইন ও মুদ্রণ
আইআরসি

সম্পাদকীয়

অধ্যাপক আবুল কাসেম ফজলুল হক (৩০ সেপ্টেম্বর ১৯৪০ - ৫ জুলাই ২০২৬) বাংলা সাহিত্যের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ লেখকদের একজন। তিনি ছিলেন একজন জ্ঞানতাপস, বিরল গুণের অধিকারী শিক্ষক ও জাতীয় অগ্রগতির নির্দেশক মনীষী। তিনি গত ৫ জুলাই হঠাৎ করেই অসুস্থ হয়ে পৃথিবী থেকে বিদায় নেন। তিনি ছিলেন শিক্ষালোকের একজন অকৃত্রিম সুহৃদ। শিক্ষালোকের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে তিনি আমাদের সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক কার্যক্রমকে উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত করেছেন।

অধ্যাপক আবুল কাসেম ফজলুল হকের লেখালেখির ভাণ্ডার বিপুল, বৈচিত্র্যও অনেক। তিনি শিক্ষা, সাহিত্য, ইতিহাস, নৈতিকতাসহ বহু বিষয়ে তাঁর গভীর ও মূল্যবান মতামত প্রকাশ করেছেন নানারকম লেখায়। এছাড়া তাঁর সম্পাদিত 'লোকায়ত' সাময়িকীটি প্রকাশের মাধ্যমে তিনি বাংলাদেশের বুদ্ধিবৃত্তিক জগতকে কেবল নতুন চিন্তায় সমৃদ্ধ করেননি, ব্যতিক্রমী সৃজনশীল চিন্তায় তরুণ প্রজন্মকে অনুপ্রাণিত করেছেন ও অনেক শক্তিশালী লেখক সৃষ্টিতে ভূমিকা রেখেছেন। কোনো চলতি ও হালকা বিষয়ে তিনি কখনও নিজেকে জড়াননি, নিজে যেমন সবসময় গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে কাজ করেছেন ও কথা বলেছেন, অন্যদেরকেও তেমনি উৎসাহিত করেছেন। লোভ ও সংকীর্ণ ব্যক্তিস্বার্থের ঊর্ধ্বে উঠে এক মহান মানুষ ছিলেন তিনি, আমাদের সমাজে যাদের দেখা পাওয়া দুরূহ। এই সংখ্যায় শিক্ষা বিষয়ক তাঁর একটি লেখা পুনর্মুদ্রণ করছি এবং তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'কালের যাত্রার ধ্বনি' নিয়ে একটি পর্যালোচনা প্রকাশ করছি। তাঁর মৃত্যুতে জাতি হারিয়েছে এক দিকনির্দেশক মনীষীকে, আর আমরা হারিয়েছি আমাদের এক পরম শ্রদ্ধেয় সুহৃদকে।

গত ১৫ই মে আমাদের মাঝ থেকে বিদায় নিয়েছেন সিদীপের সাধারণ পর্ষদের সদস্য কৃষিবিজ্ঞানি ড. এ.টি.এম. ফরিদ, তিনি সিদীপের প্রতিষ্ঠাকালীন সদস্যদেরও একজন। আমার তাঁর বিদেহী আত্মার জন্য শান্তি প্রার্থনা করি। এছাড়া এ বছর শিক্ষালোকের প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক মোহাম্মদ ইয়াহিয়ার ষষ্ঠ মৃত্যুবার্ষিকী। ছোট্ট একটি লেখায় তাঁকে স্মরণ করেছেন আমাদের এক সহকর্মী।

চলতি সংখ্যায় সিদীপের দুজন কৃষক কর্তৃক নতুন ফসল আবাদ নিয়ে গবেষণামূলক একটি লেখার ৪র্থ পর্ব প্রকাশিত হলো। এছাড়া শিক্ষা, চিকিৎসা, মুক্তপাঠাগার ইত্যাদি বিষয় নিয়ে কয়েকটি ভাল লেখা রয়েছে। সবার ভাল লাগবে আশা করছি।

সেন্টার ফর ডেভেলপমেন্ট ইনোভেশন এন্ড প্র্যাকটিসেস
বাড়ী নং- ২২/৯, ব্লক-বি, বাবর রোড, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭, ফোন: ৪৮১১৮৬৩৩, ৪৮১১৮৬৩৪।
Email : info@cdipbd.org, web: www.cdipbd.org

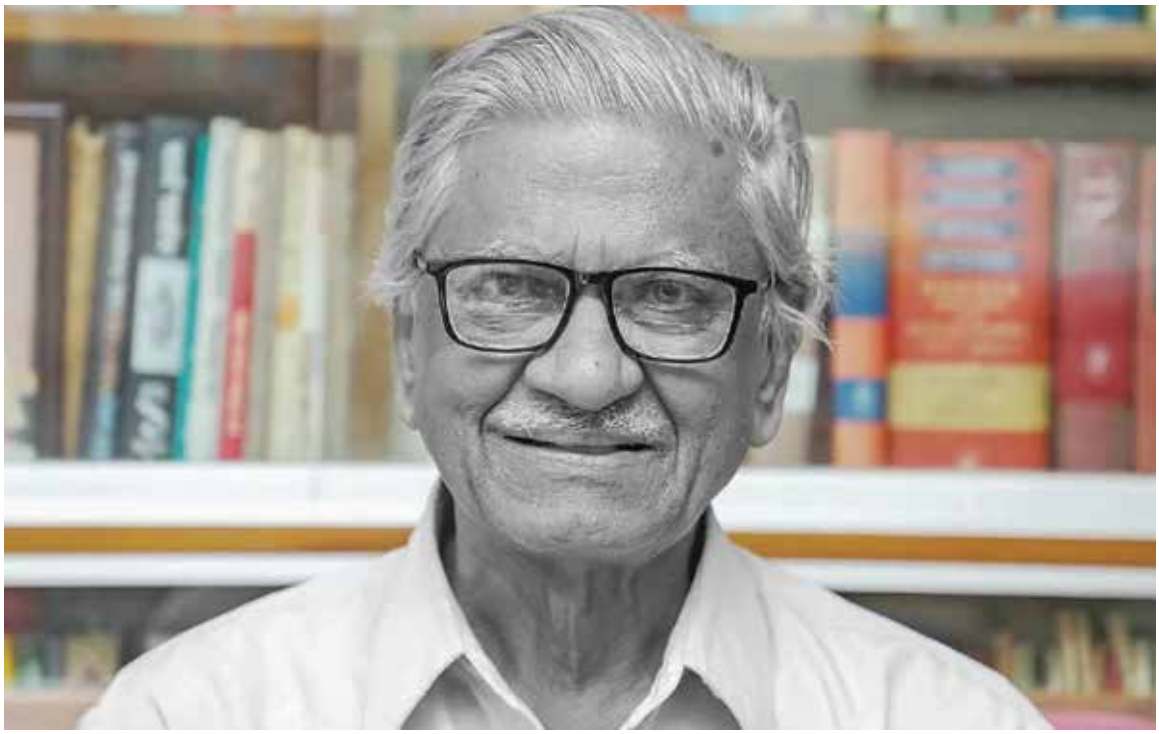

শিক্ষা ও সরকার

আবুল কাসেম ফজলুল হক

ব্রিটিশ ভারতের শিক্ষাব্যবস্থার সমালোচনা করতে গিয়ে ১৯০৬ সালে রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'শিক্ষা-সংস্কার' প্রবন্ধে টলস্টয়ের (১৮২৮-১৯১০) একটি দীর্ঘ উক্তি ইংরেজিতে উদ্ধৃত করেছিলেন। হয়তো স্বদেশের শিক্ষাব্যবস্থা সম্পর্কে তিনি যা বলতে চেয়েছিলেন, টলস্টয়ের উক্তি উদ্ধৃত করে তা বলা তাঁর পক্ষে সুবিধাজনক ছিল। টলস্টয় উক্তিটি করেছিলেন তাঁর সমকালীন জার-শাসিত রাশিয়া সম্পর্কে। কোনো উপলক্ষে ওই উক্তির বাংলা রূপান্তর আমি করেছিলাম এভাবে:

যে অবস্থার মধ্য দিয়ে আমরা চলছি, তাতে মনে হয়, ঠিক কাজটি নীরবে ধৈর্যের সঙ্গে করে যাওয়াই আমাদের সবচেয়ে বড় কর্তব্য। আমরা যা করতে চাই, তাতে সরকারের অনুমোদন চাওয়ার কোনো দরকার নেই। কেবল সরকারের অনুমোদন পরিহার করাই যথেষ্ট নয়, আমাদের কাজ করতে হবে সরকারের সাহায্য-সহায়তাও পরিহার করে। জনসাধারণের অজ্ঞতাই সরকারের শক্তির ভিত্তি। সরকার এটা জানে এবং এজন্য সরকার সব সময়েই প্রকৃত জ্ঞান বিস্তারের পথে প্রতিবন্ধকতা তৈরি করে রাখে। এ সত্য এখন আমাদের উপলব্ধি করতে হবে। সরকার কাজ করে চলছে জনসাধারণকে অজ্ঞতার অন্ধকারে নিমজ্জিত রাখার জন্য। এ-অবস্থায় দেশে জ্ঞান বিস্তারের যে ভান সরকার করে চলছে, কোনোক্রমেই তাকে চলতে দেওয়া যায় না। স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, একাডেমি, নানা ধরনের কমিটি ও কংগ্রেসের ছদ্মাবরণে সরকার জনসাধারণকে অজ্ঞতার অন্ধকারে ডুবিয়ে রাখার কাজই করছে। ভালো তখনই ভালো যখন তা প্রকৃতপক্ষেই ভালো, এবং জ্ঞানও তখনই জ্ঞান যখন তা প্রকৃতপক্ষেই জ্ঞান। ডেলিনানোফ কিংবা ডুরোমোভোর নির্দেশ অনুযায়ী যা করা হয়, জনগণের জন্য তা কল্যাণকর নয়, এবং দেশের শিক্ষার জন্যও তা সহায়ক নয়। যখন দেখি, অনুপ্রাণিত নিষ্কাম ব্যক্তিদের প্রয়াস ব্যর্থ হয়ে যায়, তখন গভীর দুঃখ অনুভব করি। বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ করি যে, মহৎপ্রাণ জ্ঞানী লোকেরা সরকারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে শক্তি ক্ষয় করেন, কিন্তু সংগ্রামে তাঁদের প্রয়াস শেষ পর্যন্ত সরকার যা করতে চায় তারই অনুকূলে যায়। রবীন্দ্রনাথ কোন অবস্থায় 'শিক্ষা-সংস্কার' প্রবন্ধটি লিখেছিলেন এবং কেন টলস্টয়ের এই উক্তি উদ্ধৃত করেছিলেন সে-সম্পর্কে কিছুই আমার জানা নেই। তবে

বুঝতে পারি, রবীন্দ্রনাথের মনে ক্ষোভ ছিল। ভারতে সেটা ছিল বঙ্গভঙ্গ- বিরোধী স্বদেশি আন্দোলনের কাল। আর জার-শাসিত রাশিয়ার অবক্ষয়ক্লিষ্ট রাষ্ট্রব্যবস্থায় টলস্টয় সরকারের প্রতি সম্পূর্ণরূপে আস্থা হারিয়েছিলেন। আমার মনে টলস্টয়ের উক্তি দাগ কাটে। টলস্টয়ের এই উক্তি থেকে ডেলিনানোফ ও ডুরোমোভোর নাম মুছে দিয়ে তাতে বাংলাদেশের কোনো কোনো মন্ত্রীর নাম বসালে এই কথাগুলোকে সম্পূর্ণ বাংলাদেশেরই অবস্থার বর্ণনা বলে মনে হবে।

১৯৭২ সাল থেকে আজ পর্যন্ত বাংলাদেশের প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের পাঠ্যপুস্তকের অবস্থা বিচার করতে গেলে আমরা দেখতে পাই, ক্রমাগত পাঠ্যপুস্তক খারাপ থেকে আরো খারাপ হয়ে চলছে। সিলেবাস, কারিকুলাম, লেখা, সেই সঙ্গে পরীক্ষাপদ্ধতি সবই ক্রমাগত খারাপ হয়ে চলছে। খারাপ আপনিতেই হচ্ছে না, মনে হয়, কোনো 'পাপচক্র সুপরিকল্পিত দুরভিসন্ধি নিয়ে বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থার ভেতরে কাজ করে চলছে। এরই মধ্যে সরকারের উত্থান-পতন ঘটছে, নতুন নতুন শিক্ষা কমিশন বসছে, কিছু কিছু পরিবর্তন ঘটানো হচ্ছে; কিন্তু শিক্ষাব্যবস্থার ক্রমবর্ধমান নিম্নগামিতায় কোনো প্রতিকার হচ্ছে না।

গভীরভাবে বিচার করলে বোঝা যায়, কোনো জাতির প্রাণশক্তির অবস্থান তার শিক্ষাব্যবস্থায়, আর শিক্ষাব্যবস্থার প্রাণশক্তি থাকে তার পাঠ্যপুস্তকে, পাঠ্যবিষয়ে, পাঠক্রমে। আর উচ্চশিক্ষার ভিত্তি প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা। বাংলাদেশে উচ্চশিক্ষার পাঠ্যবিষয়ও আমাদের রাষ্ট্র, জাতি ও সমাজের স্বাভাবিক বিকাশের ও উন্নতির পরিপন্থী। পরিকল্পিতভাবে আমাদের প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ের পাঠ্যপুস্তক খারাপ করে দিয়ে শিক্ষাব্যবস্থাকে নষ্ট করে রাখা হয়েছে। শিক্ষাব্যবস্থাকে খারাপ করে দিয়ে গোটা জনগোষ্ঠী, জাতি ও রাষ্ট্রকেই নষ্ট করে ফেলা হয়েছে। সত্যজিৎ রায়ের 'হীরক রাজার দেশে' ছবিতে রাজার একটি উক্তি, "যে যত জানে, সে তত কম মানে।" কাজেই রাজা প্রজাদের জন্য প্রকৃত শিক্ষার সুযোগ নষ্ট করে রাখে। টলস্টয়ের কথা, "জনসাধারণের অজ্ঞতাই সরকারের শক্তির ভিত্তি। সরকার কাজ করে চলছে জনসাধারণকে অজ্ঞতার অন্ধকারে নিমজ্জিত রাখার জন্য।" "জ্ঞানবিস্তারের যে ভান" সরকার তখন করে চলছিল, টলস্টয় তাকে চলতে দিতে চাইছিলেন না - সরকারকে পরিহার করে নিজের উদ্যোগে ও প্রচেষ্টায় বিকল্প ব্যবস্থার আয়োজন করেছিলেন। টলস্টয়ের পর্যবেক্ষণ অনুযায়ী সেদিনের রাশিয়ায় "স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, একাডেমি, নানা ধরনের কমিটি ও কংগ্রেসের ছদ্মাবরণে সরকার জনসাধারণকে অজ্ঞতার অন্ধকারে ডুবিয়ে রাখার কাজই" করছিল। বাংলাদেশের চলমান অবস্থার সঙ্গে অদ্ভুত মিল দেখা যায় টলস্টয়ের এই বর্ণনার। ইন্টারনেট ও টেলিভিশনের এই যুগে পৃথিবীর প্রত্যেক রাষ্ট্রেই শাসক শ্রেণির শক্তি তৎকালীন রাশিয়ার শাসক শ্রেণির শক্তির চেয়ে বহুগুণ বেশি। কিন্তু জনগণের শক্তি কমেছে?

বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থার রূপ ও প্রকৃতি এখন এমন হয়েছে যে, দেশের রাজনীতি, প্রশাসন, বিচারব্যবস্থা, শিক্ষাব্যবস্থা ইত্যাদি চালিয়ে নেওয়ার মতো লোক এই শিক্ষাব্যবস্থার ভেতর থেকে তৈরি হচ্ছে না। সামনে অবস্থা আরো খারাপ হবে ।

প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ের পাঠ্যপুস্তকের, গোটা শিক্ষাব্যবস্থার এবং রাষ্ট্রের ও জনজীবনের যে অবস্থা বাংলাদেশে আজ দেখছি, তাতে রোমাঁ রোলাঁর কাছে ম্যাক্সিম গোর্কির ১৯১৬ সালে লেখা একটি চিঠির কথা মনে পড়ছে। গোর্কি রুশ-বিপ্লবকালের প্রগতিবাদী লেখক ছিলেন। ফ্যাসিবাদের গ্রাস থেকে মানবজাতিকে রক্ষা করার জন্য রোমাঁ রোলাঁ, ম্যাক্সিম গোর্কি ও অঁরি বারবুসের আহ্বানে ১৯৩৫ সালে প্যারিসে অনুষ্ঠিত প্রগতিবাদী লেখকদের এক আন্তর্জাতিক সম্মেলনে গড়ে তোলা হয়েছিল International Association of Writers for the Defence of Culture against Facism নামে সংগঠন। বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্র ও তার সহযোগীরা মানবতার বিরুদ্ধে যে দুষ্কর্ম চালিয়ে যাচ্ছে তার প্রতিকারের ও প্রগতির লক্ষ্যে পৃথিবীর সকল রাষ্ট্রের বিবেকবান চিন্তাশীল লেখকদের আজ গড়ে তোলা কর্তব্য এমনি একটি সংগঠন। মনুষ্যত্বকে বাঁচিয়ে রাখা ও শক্তিশালী করার জন্য এই ধরনের সংগঠনের প্রয়োজন অতীতের যে কোনো সময়ের চেয়ে এখন বেশি। যুক্তরাষ্ট্রের ও তার সহযোগীদের পশুশক্তির বিরুদ্ধে সারা দুনিয়ার জনগণের সার্বিক জাগরণ ও দৃঢ় ঐক্য আজ একান্ত দরকার। বর্তমান পরিস্থিতিতে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে যে অবস্থা বিরাজ করছে তাতে গতানুগতিক ধারার কোনো সরকার জনগণের জন্য অবস্থার উন্নতি ঘটিয়ে দেবে, এমনটা আশা করার কোনো কারণ দেখি না। টলস্টয় এবং গোর্কি যেমন কায়েমি শক্তির বাইরে অবস্থান নিয়ে ভিন্ন ধারায় চিন্তা ও কাজ করেছেন, তেমনি বাংলাদেশেও আজ গতানুগতির বাইরে চিন্তা ও কাজের ভিন্ন ধারা সৃষ্টি করা দরকার। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ চলা কালে ১৯১৬ সালের শুরুতে পেট্রোগ্রাড থেকে রোমাঁ রোলাঁর কাছে ম্যাক্সিম গোর্কি লিখেছিলেন:

শ্রদ্ধাভাজন কমরেড রোমাঁ রোলাঁ,

শিশুদের জন্য বিথোভেনের জীবনী লিখতে আমি আপনাকে আহ্বান জানাচ্ছি। একই সঙ্গে আমি এইচ জি ওয়েলসকে এডিশনের এবং ফ্রিডজফকে কলম্বাসের জীবনী লিখতে আহ্বান জানিয়ে চিঠি লিখছি। আমি নিজে লিখব গরিবাল্ডির

আর ইহুদি কবি বাইয়ালিক লিখবেন মুসার জীবনী। এমনিভাবে আরো লেখা হবে।

আমি চাইছি, একালের শ্রেষ্ঠ লেখকদের অংশগ্রহণের দ্বারা মানবজাতির শ্রেষ্ঠ সন্তানদের জীবনকথা অবলম্বন করে শিশুদের জন্য একটি গ্রন্থমালা প্রকাশ করতে। এই সবগুলো গ্রন্থই আমি প্রকাশ করব।

আমি নিঃসংশয় চিত্তে অনুভব করি যে, জাঁ খ্রিস্তফ এবং বিথোভেন গ্রন্থের যিনি লেখক, মহান মানববাদী বলে যাঁর পরিচিতি, মহৎ ও উন্নত সামাজিক চিন্তার গুরুত্ব যিনি এত চমৎকারভাবে উপলব্ধি করেন, সেই আপনি আমার এই প্রয়াসে আপনার অমূল্য সহায়তা দান করতে অস্বীকৃতি জানাবেন না। বলাই বাহুল্য, আমার প্রয়াসকে আমি মহৎ ও গুরুত্বপূর্ণ বলে অনুভব করি।

আপনি সমস্ত অস্তিত্ব দিয়ে উপলব্ধি করবেন যে, আজকের দিনে শিশুদের প্রতি মনোযোগ দেওয়া আমাদের যতটা কর্তব্য ততটা আর কারো প্রতিই নয়।

আমরা বয়স্করা অল্প সময়ের মধ্যেই এই পৃথিবী ছেড়ে যাব। আমাদের সন্তান-সন্ততিদের জন্য থাকবে এক দুঃখজনক ঐতিহ্য, আমরা তাদেরকে অধিকারী করে যাব অত্যন্ত করুণ জীবনের। এই ভয়াবহ যুদ্ধ আমাদের নৈতিক পতনের এবং সাংস্কৃতিক অবক্ষয়ের অকাট্য প্রমাণ। এই সময়ে আসুন শিশুদের আমরা স্মরণ করিয়ে দিই যে, মানুষ সব সময় এত দুর্বল ছিল না, এত অপরাধী ছিল না, যেমন আজ আমরা আছি। আসুন আমরা তাদের স্মরণ করিয়ে দিই যে, বড় মাপের মানুষ - মহৎপ্রাণ মানুষ - পৃথিবীর প্রত্যেক জাতির মধ্যেই ছিলেন এবং আজো আছেন। এই সময়ে যখন বর্বরতা ও নিষ্ঠুরতা ব্যাপকভাবে চালানো হচ্ছে, তখনই এটা করতে হবে। প্রিয় রোমাঁ রোলাঁ, আকুল চিত্তে আমি আপনাকে অনুরোধ করছি বিথোভেনের জীবনী লিখতে কারণ আমি সন্দেহাতীতভাবে জানি, আপনার চেয়ে ভালো করে আর কেউ তা লিখতে পারবেন না।

আর একটি অনুরোধ। অনুগ্রহপূর্বক আমাকে জানাবেন, ফরাসি দেশের কোন লেখককে আমি অনুরোধ করতে পারি শিশুদের জন্য জোয়ান অব আর্কের ইতিহাস লিখতে। বলে দেওয়ার প্রয়োজন অনুভব করি যে, সেই ব্যক্তিকে প্রতিভাবান হতে হবে এবং তাঁর ক্যাথলিক হলে চলবে না। আশা করি আমাকে ভুল বুঝবেন না ।

বন্ধু আমার, যুদ্ধ চলাকালে প্রকাশিত আপনার সকল লেখা আমি পড়েছি। আপনার কাছে আমি নিবেদন করতে চাই যে, এই লেখাগুলো আমার অন্তরে আপনার প্রতি প্রগাঢ় সম্মানবোধ ও গভীর ভালোবাসা জাগিয়েছে। আপনি সেই স্বল্প সংখ্যক ব্যক্তিদের একজন, যুদ্ধের উন্মাদনা যাঁদের

১৯৭২ সাল থেকে আজ পর্যন্ত বাংলাদেশের প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের পাঠ্যপুস্তকের অবস্থা বিচার করতে গেলে আমরা দেখতে পাই, ক্রমাগত পাঠ্যপুস্তক খারাপ থেকে আরো খারাপ হয়ে চলছে। সিলেবাস, কারিকুলাম, লেখা, সেই সঙ্গে পরীক্ষাপদ্ধতি সবই ক্রমাগত খারাপ হয়ে চলছে

চেতনাকে বিধ্বস্ত করতে পারেনি, এবং এটা খুবই আনন্দের ব্যাপার যে আপনার অন্তরে মানবজাতির মহত্তম মূল্যবোধ ও নীতি সমূহ রক্ষা পেয়েছে।

আশা করি, যত শীঘ্র সম্ভব আমার চিঠির উত্তর দেবেন এবং আপনার মতামত ও বইয়ের আকার সম্পর্কে জানাবেন ।
প্রিয় বন্ধু, দূরদেশ থেকে আমাকে আপনার সাথে করমর্দনের সুযোগ দিন এবং পুনরায় আমার নিঃসংশয় শ্রদ্ধা ও আন্তরিক প্রশংসা গ্রহণ করুন।
আপনার কর্ম দীর্ঘস্থায়ী ও ফলপ্রসূ হোক- এই কামনা করি ।

আপনাদেরই

ম্যাক্সিম গোর্কি

মধ্যপ্রাচ্যের রাষ্ট্রগুলোতে যুদ্ধ আর গোটা দুনিয়াব্যাপী মানবতাবিরোধী কর্মকাণ্ড আমরা দেখে চলছি। আজকের অবস্থা কি প্রথম বিশ্বযুদ্ধ কালীন অবস্থার মতোই খারাপ নয়? আরও অনেক বড় যুদ্ধ কি মানবজাতির সামনে আছে না? নতুন প্রযুক্তি নিয়ে মানবজাতি তো সভ্যতার পথ ছেড়ে বর্বরতার দিকে চলছে ।

বাংলাদেশের রাষ্ট্রব্যবস্থা, সমাজব্যবস্থা ও জীবনপদ্ধতিতে একটা মৌলিক পরিবর্তন দরকার। তার জন্য যে বহুমুখী প্রস্তুতি দরকার তার সূচনা করতে পারেন সত্যসন্ধ, বিবেকবান, চিন্তাশীল লেখকেরা। সংখ্যা যত অল্পই হোক, অগ্রযাত্রীর ভূমিকা নিয়ে তাঁরা আত্মপ্রকাশ করবেন, এটা আশা করি। শিক্ষানীতি ও শিক্ষাব্যবস্থার সংস্কারের আন্দোলন দিয়েই দ্বার উদ্ঘাটিত হতে পারে বৃহত্তর আন্দোলনের।

শিশুর শিক্ষা অধিকার নিয়ে শিক্ষালোক বক্তৃতা ও আলোচনা

সিদীপ-এর শিক্ষা বিষয়ক ত্রৈমাসিক বুলেটিন 'শিক্ষালোক'র যুগ পূর্তি উপলক্ষে ঢাকার শ্যামলীতে বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা সিদীপ কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত 'শিক্ষালোক' লেখক-শিল্পী সম্মিলনে শিক্ষা বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য রাখেন ইউল্যাব এর খণ্ডকালীন শিক্ষক ও বিশিষ্ট কলামিস্ট খান মোহাম্মদ রবিউল। বক্তব্যে তিনি শিক্ষক-শিক্ষার্থী সম্পর্কের ক্রমবর্ধমান যান্ত্রিকতা, শিক্ষার মানের অবনতি এবং প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থার বিভিন্ন সংকটের ওপর আলোকপাত করেন। তিনি শিক্ষকদের মানোন্নয়ন, শিক্ষা প্রশাসনের দক্ষতা, বাজেটের কার্যকর ব্যবহার এবং মাদ্রাসা ও কিন্ডারগার্টেন শিক্ষার সুশৃঙ্খল ব্যবস্থাপনার প্রয়োজনীয়তার কথা তুলে ধরেন। পাশাপাশি, শিক্ষা বিষয়ে সরকারের নীতি ও পরিকল্পনার কার্যকর বাস্তবায়ন এবং প্রতিটি শিশুর শিক্ষার অধিকার নিশ্চিত করার ওপর গুরুত্বারোপ করেন। তাঁর বক্তব্যের সারকথা ছিল "শিক্ষা কোনো যান্ত্রিক প্রক্রিয়া নয়; এটি আলোকায়নের বিষয়। তাই শিক্ষা ব্যবস্থায় আন্তরিকতা, দায়বদ্ধতা ও মানবিক সম্পর্ক ফিরিয়ে আনা জরুরি।"

খান মোহাম্মদ রবিউলের বক্তব্যে উঠে আসা বিষয়গুলোর সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে সম্মিলনে উপস্থিত প্রকাশক জাহিদুল ইসলাম, চিত্রশিল্পী শিশির মল্লিক, উন্নয়নকর্মী শিরিন হোসেন, মুক্তিযোদ্ধা ও সমাজকর্মী আবদুল হালিম খান, উন্নয়নকর্মী হাফিজুল ইসলাম এবং সিদীপ-এর বর্তমান চেয়ারম্যান জনাব ফজলুল বারিসহ অন্যান্য লেখক, শিল্পী ও অংশগ্রহণকারীরা শিক্ষা ও শিক্ষাব্যবস্থা নিয়ে তাঁদের মতামত ও অভিজ্ঞতা তুলে ধরেন। আলোচকগণ শিক্ষা খাতে রাষ্ট্রীয় বিনিয়োগের অপ্রতুলতার বিষয়টি বর্ণনা করেন। তাঁরা বলেন, UNESCO-এর সুপারিশ অনুযায়ী শিক্ষা খাতে জাতীয় জিডিপির ৬ - ৮ শতাংশ ব্যয় করা উচিত হলেও বাংলাদেশ এখনো জিডিপির ২ শতাংশও শিক্ষা খাতে ব্যয় করতে পারেনি। স্বাধীনতার পর থেকে শিক্ষা খাতে বরাদ্দ খুবই কম রয়ে গেছে এবং আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বাংলাদেশের দেওয়া প্রতিশ্রুতির সঙ্গে বাস্তব বরাদ্দের বড় ধরনের অসামঞ্জস্য রয়েছে।

আলোচনায় শিক্ষক-শিক্ষার্থীর সম্পর্কের মানবিক ও আন্তরিক দিক নিয়েও মতামত উঠে আসে। অতীতের শিক্ষক-শিক্ষার্থী সম্পর্কের উদাহরণ টেনে শিক্ষকদের স্নেহ, শাসন, আন্তরিকতা ও শিক্ষার্থীদের প্রতি নিবেদনের কথা স্মরণ করা হয়। পাশাপাশি সীমিত সুযোগ-সুবিধার মধ্যেও শিক্ষার প্রতি দায়বদ্ধতা ও সামাজিক দায়িত্ববোধের যে দৃষ্টান্ত তৈরি হয়েছিল, সেটিও আলোচনায় উঠে আসে। শিক্ষার্থীদের মধ্যে বই পড়ার অভ্যাস ও চিন্তাশীলতা গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তার কথাও আলোচনায় গুরুত্ব পায়। শুধু পাঠ্যবই, পরীক্ষা ও সার্টিফিকেট নির্ভর শিক্ষার পরিবর্তে বিস্তৃত পাঠ, মুক্তচিন্তা ও বাস্তবজীবন থেকে শেখার ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়। এ প্রসঙ্গে "Learn, Delearn, Relearn" ধারণার মাধ্যমে অর্জিত জ্ঞানকে বাস্তব অভিজ্ঞতার সঙ্গে সমন্বয় করে নতুনভাবে শেখার প্রয়োজনীয়তার কথাও উঠে আসে। আলোচনায় শিক্ষাকে শুধু প্রাতিষ্ঠানিক বা একাডেমিক শিক্ষার মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে অনানুষ্ঠানিক শিক্ষার গুরুত্বও তুলে ধরা হয়। শিক্ষাবিষয়ক জ্ঞান, চিন্তা ও ধারণা সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার ক্ষেত্রে 'শিক্ষালোক'-এর মতো উদ্যোগের ভূমিকা এবং শিক্ষা নিয়ে সামাজিক সচেতনতা তৈরির প্রয়োজনীয়তার কথা বলা হয়। বিজ্ঞানমনস্কতা, যুক্তিবোধ, মানবিকতা ও নৈতিক মূল্যবোধের সংকট নিয়েও উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়। প্রযুক্তির অগ্রগতির পাশাপাশি মানুষের চিন্তা ও মননের বিকাশ নিশ্চিত করার প্রয়োজনীয়তার কথা বলা হয়। একই সঙ্গে শিক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের মধ্যে দেশপ্রেম, নাগরিক দায়িত্ববোধ ও নৈতিক মূল্যবোধ গড়ে তোলার ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়।

শিক্ষাব্যবস্থার সংকটের জন্য শুধু সরকার, রাজনীতিবিদ বা প্রশাসনকে দায়ী না করে নাগরিক সমাজ ও সংশ্লিষ্ট সব পক্ষের দায়িত্ব ও অংশগ্রহণের বিষয়টিও আলোচনায় আসে। শিশুর শিক্ষাকে শুধু শ্রেণিকক্ষের পড়াশোনার মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে তার শারীরিক ও মানসিক বিকাশের বিষয়টিও আলোচনায় উঠে আসে। সেই সাথে পুষ্টি, খেলাধুলা, সাংস্কৃতিক চর্চা ও সুস্থ পরিবেশকে শিক্ষার অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে বিবেচনা করার প্রয়োজনীয়তার কথা বলা হয়।

- মাহফুজুল মিথুন, *গবেষণা ও প্রকাশনা কর্মকর্তা, সিদীপ*

মোহাম্মদ ইয়াহিয়া
অনুসরণীয় উন্নয়ন কর্মবীর

মো. জাহিদুল ইসলাম

গত ২২ আগস্ট ছিল সিদীপের প্রতিষ্ঠাতা নির্বাহী পরিচালক মোহাম্মদ ইয়াহিয়ার ৬ষ্ঠ মৃত্যুবার্ষিকী। ২০২০ সালের এই দিনে কোভিড আক্রান্ত হয়ে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর মৃত্যুতে সিদীপের কর্মীদের মধ্যে এক অপার শূন্যতার সৃষ্টি হয়েছে। তিনি ছিলেন কর্মীদের কাছে একজন আদর্শ অভিভাবক। যার ছায়ায় কর্মীরা পেতো নির্ভরতা ও কাজের অনুপ্রেরণা।

আমি ২০০৯ সালে সিদীপে যোগদানের পর থেকে মোহাম্মদ ইয়াহিয়া স্যারের সান্নিধ্য পেয়েছি। আত্মসচেতন ও আত্মবিশ্বাসী ইয়াহিয়া স্যার ছিলেন সৎ, পরিশ্রমী, ধৈর্যশীল এবং মানবিক গুণের অধিকারী একজন মানুষ। তাঁর হাত ধরেই শিখেছি উন্নয়নমূলক চিন্তা-চেতনার নানাদিক। তিনি শিখিয়েছেন দেশের প্রান্তিক পর্যায়ের তৃণমূল মানুষদের কাছে যাওয়া, তাদের সাথে মিশে তাদের চিন্তা-ভাবনার সাথে পরিচিত হওয়া এবং তাদের উন্নয়নে প্রতিনিয়ত নানামুখী কাজ করার প্রত্যয়। তাঁর শিক্ষা অনুযায়ী আজ নিজেকে একজন 'উন্নয়নকর্মী' হিসেবে পরিচয় দিতে গর্ববোধ করি।

মোহাম্মদ ইয়াহিয়া স্যার বিশ্বাস করতেন যে বিদেশী কোনরকম সাহায্য ও খবরদারি ছাড়া নিজের মেধা ও পরিশ্রমের মাধ্যমে দেশের প্রান্তিক জনসাধারণের আর্থসামাজিক উন্নয়ন সম্ভব। সেই বিশ্বাসকে ধারণ করে সিদীপ 'আপন শক্তিতে বেড়ে ওঠা' স্লোগানকে ধারণ করে ৩০ বছর পূর্তি উদযাপন করেছে। তাঁর কাছে আর্থসামাজিক উন্নয়ন মানে প্রত্যন্ত এলাকার জনসাধারণের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও মানবিক উন্নয়ন। এর জন্য প্রয়োজন সামগ্রিক উন্নয়ন। অর্থাৎ অর্থনৈতিক, শিক্ষাগত, স্বাস্থ্যগত ও সাংস্কৃতিক ইত্যাদি সকল ক্ষেত্রের উন্নয়ন। তিনি শিক্ষাকে ছড়িয়ে দিতে চেয়েছেন প্রতিটি গ্রামের প্রতিটি ঘরে। তাঁর প্রত্যয় ছিল 'কোনো গাঁয়ে কোন ঘর কেউ রবে না নিরক্ষর'। তিনি মনে করতেন দেশের এনজিওদের দ্বিতীয় লক্ষ্য হোক শিক্ষা-উন্নয়ন।

তিনি লিখেছেন, "সামাজিক উন্নয়নে বিশেষত নারীর ক্ষমতায়ন, অধিকার সচেতনতা, শিক্ষার প্রতি আগ্রহ, স্বাস্থ্য সচেতনতা ইত্যাদি সৃষ্টিতে সরকারের পাশাপাশি এনজিওগুলোও উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করছে। এনজিওগুলো তাদের দেশব্যাপী নেটওয়ার্ক, তৃণমূল পর্যায় পর্যন্ত গণসংযোগ, সাংগঠনিক দক্ষতা ইত্যাদি কারণে বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে সরকারি উদ্যোগসমূহকে বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করে থাকে। ক্ষুদ্রঋণে এনজিওর একটি বিশেষ অবদান রাখার পর যদি এনজিও আজ শিক্ষাকে তাদের দেশব্যাপী সফলতার দ্বিতীয় ফ্রন্ট হিসাবে খুলে দেয় তবে সহযোগী সংস্থা হিসাবে সরকারের সাথে মিলে আগামি দশ বছরেরও কম সময়ের ভেতর বাংলাদেশ থেকে নিরক্ষরতাকে নির্মূল করে দেওয়া সম্ভব। আসুন আমরা এই যুদ্ধে অবতীর্ণ হই।" [এনজিওর দ্বিতীয় লক্ষ্য হোক শিক্ষা উন্নয়ন- মোহাম্মদ ইয়াহিয়া; শিক্ষালোক, ফেব্রুয়ারি ২০১৫ সংখ্যা]

নানান প্রতিকূলতা পেরিয়ে সিদীপ যখন যৌবনময় তখনই আমরা মোহাম্মদ ইয়াহিয়া স্যারকে চিরতরে হারিয়েছি। আমরা হারিয়েছি এমন এক ব্যক্তিত্বকে যিনি উন্নয়নক্ষেত্রে ছিলেন ব্যতিক্রমী, সৎ, নিষ্ঠাবান, প্রচারবিমুখ, অনুকরণীয় ও অনুসরণীয়। পাশাপাশি তিনি ছিলেন জ্ঞানপিপাসু, সাহিত্যপ্রেমী ও বিজ্ঞান অনুরাগী মহান এক মানুষ।

তিনি আমাদের ছেড়ে চলে গেছেন, তবে আমাদের জন্য রেখে গেছেন তাঁর স্বপ্ন, চিন্তা, কর্ম ও আদর্শকে এগিয়ে নেয়ার পথ ও গুরু দায়িত্ব।

লেখক: উন্নয়নকর্মী, সিদীপ

কেইস স্টাডি

নতুন ফসল আবাদ (৪র্থ পর্ব)

সিদীপের দুই জন কৃষকের একটি করে প্লটে দুই বছরে বিভিন্ন ফসলের চাষাবাদ পদ্ধতি, উৎপাদন ও আয়-ব্যয়[১]

প্রতাপ চন্দ্র রায় ও ফজলুল বারি

[আলোচ্য নিবন্ধের এটি ৪র্থ পর্ব। সিদীপের দুইজন কৃষকের একটি করে প্লটে গত ২০২২ সালের মধ্য এপ্রিল থেকে শুরু করে ২০২৪ সালের জুন মাস পর্যন্ত অর্থাৎ ২ বছর ৩ মাস (২৭ মাস) যাবত যে সকল ফসলের চাষ তারা করেছেন সে সকল ফসলের চাষ পদ্ধতি এবং আয়-ব্যয়ের হিসাব তুলে ধরা হয়েছে এই নিবন্ধে। যেহেতু এটি দীর্ঘ সময় ধরে করা হয়েছে তাই এতে কৃষক দু'জনের জমি ব্যবহারের সময়কাল সম্পর্কে একটি চিত্রও ফুটে উঠেছে।

প্রথম পর্বে (শিক্ষালোক অক্টোবর'২৪-জানুয়ারি'২৫ সংখ্যা) এই নিবন্ধের ভূমিকা, উদ্দেশ্য, কৃষক নির্বাচন, তথ্য সংগ্রহ পদ্ধতি, ২৭ মাস চাষকৃত সকল ফসলের নাম ও উৎপাদনের সময়কাল, দুই ফসলের মাঝখানে জমি খালি থাকার সময়কাল ইত্যাদি বিবরণ দেয়া হয়েছে। ২য় পর্বে (ফেব্রুয়ারি-এপ্রিল'২৫ সংখ্যা) নির্ধারিত কৃষক দু'জন, যারা উভয়েই গ্রীষ্মকালীন টমেটো ফসল দিয়ে চাষাবাদ শুরু করেছেন তাদের চাষ পদ্ধতি, উৎপাদনের হার এবং আয়-ব্যয়ের হিসাব তুলে ধরা হয়েছে। ৩য় পর্বে (অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০২৫ সংখ্যা) এ দু'জন কৃষকের একজন করল্লা এবং দ্বিতীয় জন ক্যাপসিকাম ফসলের চাষ করেছেন। এই দুটি ফসলের বৃত্তান্ত বর্ণনা করা হয়েছে। পরবর্তীতে তাদের মধ্যে একজন কৃষক মনির হোসেন চিচিঙ্গা এবং অন্যজন মো. কামরুল পুনরায় ক্যাপসিকাম ফসলের চাষ করেন। এই দুটি ফসলের চাষ পদ্ধতি ও আয়-ব্যয় নিয়ে এই ৪র্থ পর্বে আলোচনা করা হলো।

---

[১] এই নিবন্ধটির জন্য যাবতীয় তথ্যাদি দিয়ে সার্বক্ষণিক সহযোগিতা করেছেন যে দু'জন কৃষক, জনাব মনির হোসেন ও জনাব মো. কামরুল, তাদের দু'জনকে এই সহযোগিতার জন্য আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই, তাদের সহযোগিতা ছাড়া এই নিবন্ধটি লেখা সম্ভব হতো না। তাদের কাছ থেকে প্রতি সপ্তাহে দু'জন উপ-সহকারী কৃষি কর্মকর্তা জনাব মো. শামীম হোসেন এবং জনাব মো. ফায়সাল হোসেন নিষ্ঠার সঙ্গে তথ্য সংগ্রহ করে আমাদের কাছে পাঠিয়েছেন ও যোগাযোগ রক্ষা করেছেন সেজন্য তাদের দু'জনকেও আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

মনির হোসেনের চিচিঙ্গা এবং মো. কামরুলের ক্যাপসিকাম ফসলের চাষাবাদ পদ্ধতি, উৎপাদনের হার ও আয়-ব্যয়

চিচিঙ্গা এবং ক্যাপসিকাম ফসলের উৎপত্তি: চিচিঙ্গা (Trichosanthes Cucumerina) কিউকারবিটিস পরিবারের একটি লতানো সবজি যার উৎপত্তি মূলত দক্ষিণ এশিয়া অঞ্চলে। বিশেষ করে ভারত, বাংলাদেশ, শ্রীলঙ্কা বলে ধারণা করা হয়। তবে এর কিছু বন্য পূর্বপুরুষ আফ্রিকার উষ্ণ অঞ্চলেও পাওয়া যায়। যেখান থেকে প্রাকৃতিক বিবর্তন ও মানুষের বাছাই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বড়, কোমল ও খাদ্যপোযোগী জাতের বিকাশ ঘটে এবং পরে এটি দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া জুড়ে বিস্তার লাভ করে। উষ্ণ ও আর্দ্র জলবায়ু চিচিঙ্গা চাষের জন্য উপযোগী; ২৫-৩৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা চিচিঙ্গা চাষের জন্য উপযুক্ত। এর জন্য আদর্শ পরিবেশ হলো ভালো পানি নিষ্কাশনযুক্ত দোআঁশ বা বেলে দোঁআশ মাটি। তবে জলাবদ্ধতা একেবারেই সহ্য করে না। মাটির পিএইচ ৬.০ থেকে ৭.৫ হলে ভালো হয় এবং জৈব সারসমৃদ্ধ, ঝুরঝুরে ও উর্বর মাটি গাছের বৃদ্ধি ও ফলন বাড়ায়। আর ক্যাপসিকাম ফসলটির উৎপত্তি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে ৩য় পর্বের লেখায়। যেহেতু মো. কামরুল ঐ সময়েও ক্যাপসিকাম চাষ করে ফসল নষ্ট হয়ে যাওয়ায় পুনরায় একই ফসল চাষ করেন তাই এখানে তার পুনরাবৃত্তি করা হলো না।

জমির পরিমাণ: মনির হোসেন চিচিঙ্গা চাষ করেছেন ৭২ শতক জমিতে। মনির হোসেন অবসর সময়ে প্রায়ই ইউটিউবে কৃষিকাজ সম্পর্কিত বিভিন্ন অনুষ্ঠান দেখে থাকেন। আর বর্তমানে খরচের তুলনায় এ ধরনের ফসল চাষ অনেকটাই লাভজনক। যার জন্য তিনি চাষাবাদের জন্য চিচিঙ্গাকে বেছে নেন। অন্যদিকে মো. কামরুল তার কুয়েত প্রবাস জীবনে সেখানকার কৃষি ফার্মে কাজ করেছেন। যার জন্য তার মধ্যে আধুনিক কৃষি নিয়ে কাজ করার একটি প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। এ কারণেই মো. কামরুল পুনরায় ক্যাপসিকাম চাষে বেশি উদ্বুদ্ধ হয়েছেন। ক্যাপসিকাম ফসলটি নষ্ট হয়ে যাওয়ার পরও তিনি ক্যাপসিকাম ফসলটি চাষ করার ঝুঁকি নিয়েছেন এবং ৬০ শতক জমিতে চাষ করেছেন ।

তারা যেভাবে এই ক্যাপসিকাম ও চিচিঙ্গা চাষাবাদ করেছেন তার পূর্ণ প্রক্রিয়া অর্থাৎ শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত নিম্নে উপস্থাপন করা হলো। এখানে উল্লেখ্য যে, সমস্ত উপকরণের পরিমাণ এবং ব্যয়ের টাকার পরিমাণ মনির হোসেনের বেলায় ৭২ শতক এবং মো. কামরুলের বেলায় ৬০ শতক জমি হিসেবে গণ্য করতে হবে। তারা দুজনই প্রতি সপ্তাহে যে হিসাব দিয়েছেন আমরা এখানে তা উল্লেখ করেছি। লেখাটির শেষে এই হিসাবের সারাংশটি একর প্রতি রুপান্তর করেও দেখানো হয়েছে।

জমি প্রস্তুতি: ২০২৩ সালের এপ্রিল মাসের শেষের দিকে মনির হোসেন এবং মো. কামরুল ২০২৩ সালের মে মাসের শেষ সপ্তাহে তাদের জমি প্রস্তুতির কাজ শুরু করেন[২]। জমি প্রস্তুতির সময় ট্রাক্টরের মাধ্যমে মনির হোসেন চাষ দেন ৩টি ও মো. কামরুল চাষ দেন সর্বমোট ৪টি। ট্রাক্টরের মাধ্যমে চাষবাবদ মনির হোসেনের সর্বমোট ১২,৫০০ টাকা ও মো. কামরুলের ১৫,০০০ টাকা ব্যয় হয়েছে। চাষ পরবর্তীতে মনির হোসেন ও মো. কামরুল যে সমস্ত সার ব্যবহার করেছেন তার নাম, পরিমাণ ও মূল্যমান নিম্নরূপ-

মনির হোসেনের ক্ষেত্রে

সারের নাম	সারের পরিমাণ (কেজি)	মূল্য (কেজি প্রতি)	মোট মূল্য
কম্পোস্ট	১,০০০	৩	৩,০০০
টিএসপি	-	-	-
এমওপি	-	-	-
জিপসাম	-	-	-
		সর্বমোট খরচ	৩,০০০

মো. কামরুলের ক্ষেত্রে

সারের নাম	সারের পরিমাণ (কেজি)	মূল্য (কেজি প্রতি)	মোট মূল্য
কম্পোস্ট	২,৪০০	১২	২৮,৮০০
টিএসপি	১০০	৩৫	৩,৫০০
এমওপি	৩০	২৫	৭৫০
জিপসাম	৪৮	১৫	৭২০
		সর্বমোট খরচ	৩৩,৭৭০

[২] এখানে উল্লেখযোগ্য যে মনির হোসেন এর আগে ধনিয়া ফসল তোলা শেষ করেছেন ১০ নভেম্বর, ২০২২ তারিখে অর্থাৎ ৫ দিন জমিটি পতিত ছিল এবং মো: কামরুল এর আগে তার গ্রীষ্মকালীন টমেটো ফসল তোলা শেষ করেছেন ২০ নভেম্বর, ২০২২ তারিখে অর্থাৎ ১১৫ দিন জমিটি পতিত ছিল। বিস্তারিত প্রথম পর্বে বর্ণনা করা আছে।

বীজ ও চারা সংগ্রহ: মনির হোসেন চিচিঙ্গা চাষের জন্য আশা প্লাস (হাইব্রীড) জাতের বীজ ব্যবহার করেছেন এবং মো. কামরুল ক্যাপসিকাম চাষের জন্য গ্রীন বেল জাতের চারা ব্যবহার করেছেন। ক্যাপসিকাম চারা ও চিচিঙ্গার বীজ তারা স্থানীয় বাজার থেকেই সংগ্রহ করেছেন এবং চারা ও বীজ সংগ্রহ করতে তাদের কোন অসুবিধা হয়নি। মনির হোসেন মোট ৬০ প্যাকেট অর্থাৎ ১০ গ্রাম করে মোট ৬০০ গ্রাম বীজ সংগ্রহ করেছেন যার মূল্য প্রতি প্যাকেট ২৭০ টাকা করে মোট ১৬,২০০ টাকা। অন্যদিকে মো. কামরুল গ্রীন বেল জাতের চারা ব্রাহ্মণবাড়িয়ার গ্রীন নার্সারী থেকে সংগ্রহ করেছেন। তিনি মোট সাত হাজার পাঁচশত (৭,৫০০)টি চারা সংগ্রহ করেছেন যার মূল্য ছিল প্রতি পিস ৭ টাকা করে মোট ৫২,৫০০ টাকা। চারা নিয়ে আসার জন্য খরচ হয়েছে ৮০০ টাকা।

মনির হোসেন ২৫-০৪-২০২৩-এ তার জমিতে বীজ বপন শুরু করেন এবং মো. কামরুল ২৫-৫-২০২৩-এ চারা রোপণের কাজ শুরু করেন। মনির হোসেনের বীজ বপনের জন্য ৫ জন শ্রমিকের প্রয়োজন হয়েছে যার দৈনিক পারিশ্রমিক ছিল জনপ্রতি ৬০০ টাকা করে এবং মো. কামরুলের চারা রোপণের জন্য ১২ জন শ্রমিক নিয়েছিলেন। তবে এর মধ্যে ৮ জন ছিল পুরুষ শ্রমিক ও বাকি ৪ জন ছিল নারী শ্রমিক। এখানে পুরুষ শ্রমিকের দৈনিক শ্রমমূল্য ৫৫০ টাকা ও নারী শ্রমিকের দৈনিক শ্রমমূল্য ৩৫০ টাকা এবং চারা রোপণের জন্য মো. কামরুলের মোট খরচ হয়েছে ৫,৮০০ টাকা। মনির হোসেন প্রতিটি মাচায় ৩টি করে চিচিঙ্গার বীজ বপন করেছেন।

আন্তঃফসল পরিচর্যা

মাচা তৈরি: মনির হোসেন চিচিঙ্গা চাষের জন্য মাচা তৈরি করেছেন যেহেতু এটি লতানো জাতীয় উদ্ভিদ। এর জন্য তার বিভিন্ন ধরনের উপকরণের প্রয়োজন হয়েছে যেমন বাঁশ, সুতা, ও জাল। এখানে বলে রাখা ভালো, যেহেতু মনির হোসেন পূর্বে করল্লা চাষ করেছেন যার জন্য চিচিঙ্গা চাষের জন্য তার নতুন করে কোন বাঁশ ও জাল প্রয়োজন হয়নি।

চিচিঙ্গা ফসলের উৎপাদন পর্যায়

তবে সুতা ক্রয় বাবদ তার ২,২০০ টাকা খরচ হয়েছে। অন্যদিকে মো. কামরুল তার জমিতে শুধু সুতার ব্যবহার করেছেন গাছকে সোজাভাবে দাঁড় করিয়ে রাখার জন্য। এই সুতার জন্য তার খরচ হয়েছে মোট ৬,৫০০ টাকা। জমিতে সুতা ব্যবহারের জন্য শ্রমিক বাবদ তার খরচ হয়েছে ৪,৪০০ টাকা; দৈনিক ৫৫০ টাকা হারে ৪ জন শ্রমিকের ২ দিন ।

সার ব্যবহার: মনির হোসেন জৈব সার হিসেবে কেবল গোবর সার ব্যবহার করেছেন। এছাড়াও তিনি বিভিন্ন ধরনের অজৈব সার ব্যবহার করেছেন। মো. কামরুল জৈব সার ব্যবহার করেছেন তবে তার অধিকাংশই নিজের গরুর খামারে উৎপাদিত সার। তিনি অজৈব সারও ব্যবহার করেছেন। তাদের দু'জনের ব্যবহৃত সারের নাম, পরিমাণ ও মূল্য নিচে তালিকায় দেখানো হলো।

মনির হোসেনের ক্ষেত্রে

সারের নাম	সারের পরিমাণ (কেজি)	মূল্য (কেজি প্রতি)	মোট মূল্য
টিএসপি	২৬০	৪২	১০,৯২০
ইউরিয়া	১৪৫	২৭	৩,৯১৫
এমওপি	১৫০	২০	৩০০০
কম্পোস্ট	৪৮০	১২	৫,৭৬০
		সর্বমোট খরচ	২৩,৫৯৫

মো. কামরুলের ক্ষেত্রে

সারের নাম	সারের পরিমাণ (কেজি)	মূল্য (কেজি প্রতি)	মোট মূল্য
টিএসপি	৩৫	৪২	১,৪৭০
ইউরিয়া	৯০	৩০	২,৭০০
এমওপি	৬০	২৫	১,৫০০
কম্পোস্ট	১২	৯৫০	১১,৪০০
		সর্বমোট খরচ	১৭,০৭০

উপরোক্ত সারসমূহের ক্ষেত্রে মনির হোসেন বীজ বপনের ১৫ দিন পর অর্ধেক এবং বাকি অর্ধেক আরো ১৫ দিন পর ব্যবহার করেছেন। অন্যদিকে মো. কামরুল প্রথম কিস্তিতে সার প্রদানের ১৪ দিন পর উপরোক্ত সারসমূহ তার জমিতে প্রয়োগ করেছেন। মনির হোসেনের মোট ১০ জন শ্রমিকের প্রয়োজন হয়েছে যার দৈনিক শ্রম মূল্য ৬০০ টাকা করে। মো. কামরুলের প্রয়োজন হয়েছে ১১ জন শ্রমিক যার দৈনিক শ্রমমূল্য ছিল ৫৫০ টাকা করে।

ক্যাপসিকাম চারা বৃদ্ধি পর্যায়

কীটনাশক ও আগাছা দমন: মনির হোসেন ও মো. কামরুল যে সমস্ত কীটনাশক ব্যবহার করেছেন তা হলো কার্বাইন ২০% ইসি, কট ১০ ইসি, ভলিয়াম ফ্লেক্সি, অটোস্টিন, ফেরোমন ফাঁদ, ফ্লোরা, টিডো, সানটাপ প্রভৃতি। এর মূল্য ও পরিমাণ নিম্নে প্রদান করা হলো।

মনির হোসেনের ক্ষেত্রে

কীটনাশকের নাম	পরিমাণ	মূল্য (ইউনিট প্রতি)	মোট মূল্য
কার্বাইন ২০% ইসি	১২	২২০	২,৬৪০
কট ১০ ইসি	১৫	২০০	৩,০০০
ভলিয়াম ফ্লেক্সি	৫	৩৫০	১,৭৫০
ফেরোমন ফাঁদ	৩০	৫৫	১,৬৫০
ফ্লোরা	৫	১৫০	৭৫০
		সর্বমোট খরচ	৯,৭৯০

মো: কামরুলের ক্ষেত্রে

কীটনাশকের নাম	পরিমাণ	মূল্য (ইউনিট প্রতি)	মোট মূল্য
অ্যাবামেকটিন ১.৮% ইসি	১৮	১৫০	২,৭০০
সানটাপ ৫০ এসপি	২০	১২০	২,৪০০
অ্যাসাইল ৩০এসজি	১৬	৮০	১,২৮০
ইমাবেকটিন বেনজোনেট	২৫	২৫০	৬,২৫০
-	-	-	-
		সর্বমোট খরচ	১২,৬৩০

উপরোল্লেখিত সমস্ত কীটনাশকই স্প্রে মেশিনের সাহায্যে ব্যবহার করা হয়েছে। মনির হোসেনের পূর্বেই দুটি আধুনিক স্প্রে মেশিন ছিল যা তিনি ব্যবহার করেছেন। মনির হোসের কীটনাশক প্রয়োগের জন্য ৬০০ টাকা শ্রমমূল্যে ৬ জন শ্রমিক নিয়েছিলেন ২ দিনে। এ জন্য তার মোট খরচ হয়েছে ৭,২০০ টাকা। মো. কামরুলের পূর্বে ২টি স্প্রে মেশিন ছিল। কীটনাশক প্রয়োগের জন্য তিনি মোট ১২ জন শ্রমিক দিয়ে ৬০০ টাকা শ্রমমূল্যে ৩ দিনে সম্পন্ন করেছেন। মো. কামরুলের কীটনাশক প্রয়োগের জন্য শ্রমিক বাবদ মোট খরচ হয়েছে ২১,৬০০ টাকা।

সেচ: মনির হোসেন মোট ৩টি সেচ প্রদান করেছিলো এবং মো. কামরুলও ৩টি সেচ প্রদান করেছিল। সেচের জন্য মনির হোসেনের মোট ২৪০০ টাকা খরচ হয়েছে এবং কামরুলের খরচ হয়েছে ২৫০০ টাকা।

চারা বৃদ্ধি পর্যায়

ক্যাপসিকাম ফসলের পরিপক্কতা পর্যায়

ক্যাপসিকামের পরিপক্কতা পর্যায়

ফসল তোলা: মনির হোসেন বীজ বপনের প্রায় ১.৫ মাস পর থেকে অর্থাৎ ১০ জুন, ২০২৩ থেকে ফসল তোলা শুরু করেন। সাধারণত গড়ে ৩-৪ দিন পরপর ফসল তোলা হতো। মনির হোসেন মোট ১০ বার তার জমি থেকে ফসল তুলেছেন। ফসল তোলার জন্য দৈনিক ভিত্তিতে তিনি শ্রমিক নিয়োগ দিতেন। ফসল তোলার জন্য মনির হোসেন শ্রমিক বাবদ মোট ৬,০০০ টাকা খরচ করেছেন। মনির হোসেন ১৫ জুলাই ২০২২৩ পর্যন্ত ফসল তুলেছেন ।

ক্যাপসিকাম ফসল সংগ্রহ কার্যক্রম

অন্যদিকে মো. কামরুল চারা রোপণের প্রায় ৯০ দিন পরে অর্থাৎ ২৪ আগস্ট, ২০২৩ থেকে ফসল তোলা শুরু করেন। সাধারণত গড়ে ৭-৮ দিন পর পর ফসল তোলা হতো। মো. কামরুল মোট ৮ বার তার জমি থেকে ফসল তুলেছেন। ফসল তোলার জন্য দৈনিক ভিত্তিতে তিনি শ্রমিক নিয়োগ দিতেন। মো. কামরুল ফসল তোলার জন্য দৈনিক ভিত্তিতে নারী শ্রমিক বেশি নিতেন। অর্থাৎ প্রতিদিন ৩ জন শ্রমিক নিলে এর মধ্যে ২ জন থাকত নারী ও ০১ জন থাকত পুরুষ। নারী শ্রমিকের দৈনিক শ্রমমূল্য ছিল ৩৫০ টাকা এবং পুরুষ শ্রমিকের ৫৫০ টাকা। সে হিসেবে ফসল তোলার জন্য শ্রমিক বাবদ মোট ৯,৫০০ টাকা খরচ করেছেন। মো. কামরুল অক্টোবর'২৩ এর ৩য় সপ্তাহ অর্থাৎ ২৪ তারিখ পর্যন্ত ফসল তুলতে পেরেছিলেন।

ফসল বিক্রি: মনির হোসেন তার উৎপাদিত ফসল নিকটবর্তী নিমসার বাজারে বিক্রি করেন। ৩-৪ দিন পরপর তিনি ফসল বিক্রি করতেন। মনির হোসের তার উৎপাদিত ফসল বাজারে বিক্রি করার জন্য নিজস্ব ক্রেট ব্যবহার করেছেন। ক্রেট এর জন্য তার বাড়তি কোন খরচ করতে হয়নি। তার সমস্ত ফসল বাজারে নিয়ে যাবার জন্য ২,৭০০ টাকা খরচ হয়েছে। উৎপাদিত ফসল বিক্রির প্রথম দিকে তিনি ৫০ টাকা কেজিতে বিক্রি করেন, মাঝের দিকে ৩৫ টাকা এবং সর্বশেষে গড়ে ২৫ টাকা কেজিতে তিনি ফসল বিক্রি করেন।

মো. কামরুল তার উৎপাদিত ফসল পাইকারের নিকট সরাসরি বিক্রি করতেন। তার উৎপাদিত ফসল বাজারে নিয়ে যেতে হয়নি। মাঠ থেকেই তার ফসল পাইকারগণ ক্রয় করে নিয়েছেন। ৭-৮ দিন পরপর তিনি ফসল বিক্রি করতেন। মো. কামরুল তার উৎপাদিত ফসল বিক্রির প্রথম দিকে ২৫০ টাকা কেজিতে বিক্রি করেন, মাঝের দিকে ১৪০ টাকা এবং সর্বশেষে গড়ে ১২০ টাকা কেজিতে ফসল বিক্রি করেন।

উৎপাদন: মনির হোসেনের মোট উৎপাদিত ফসলের পরিমাণ ছিল ৫,০১৪ কেজি। এর মধ্যে তিনি বাজারে বিক্রি করেছেন ৪,৯৫০ কেজি এবং বাকি ৬৪ কেজি তিনি নিজে খাওয়া ও অন্যান্য আত্মীয় স্বজনকে দিয়েছেন। মনির হোসেনের নষ্ট হয়ে যাওয়া ফসলের পরিমাণ ছিল আনুমানিক ১,০০০ কেজি। পামকিন বিটল পোকার অতিরিক্ত আক্রমণে মনির হোসেনের এ ফসল নষ্ট হয়েছে। মনির হোসেন সর্বমোট ফসল বিক্রি করেছেন ১,৮৬,২৫০ টাকা। এর মধ্যে প্রথম ১,৭০০ কেজি ফসল ৫০ টাকা দরে, মাঝের ২,০০০ কেজি ৩৫ টাকা দরে এবং শেষের ১,২৫০ কেজি ২৫ টাকা দরে বিক্রি করেছেন ।

মো. কামরুলের মোট উৎপাদিত ফসলের পরিমাণ ছিল ৬,০০০ কেজি । এর মধ্যে তিনি বাজারে বিক্রি করেছেন ৫,৯০০ কেজি এবং বাকি ১০০ কেজি তিনি নিজে খাওয়া ও অন্যান্য আত্মীয় স্বজনকে দিয়েছেন। মো. কামরুলের নষ্ট হয়ে যাওয়া ফসলের পরিমাণ ছিল আনুমানিক ৩,০০ কেজি। মো. কামরুল সর্বমোট ফসল বিক্রি করেছেন ৬,১২,০০০ টাকা। এর মধ্যে প্রথম ১,০০০ কেজি ফসল ১৬০ টাকা দরে, মাঝের ১,৫০০ কেজি ১২০ টাকা দরে এবং শেষের ৩,৪০০ কেজি ৮০ টাকা দরে বিক্রি করেছেন।

ক্যাপসিকাম ফসল সংগ্রহ কার্যক্রম

মনির হোসেন ও মো. কামরুলের আয়-ব্যয়ের হিসাব: চিচিঙ্গা চাষে মনির হোসেন বিভিন্ন খাতে যে টাকা ব্যয় করেছেন এবং তার উৎপাদিত ফসল বিক্রি করে যে টাকা পেয়েছেন তা নিম্নের তালিকায় দেখানো হল। মনির হোসেন চিচিঙ্গা উৎপাদনের জন্য মোট ব্যয় করেছেন ৯৪,৫৮৫ টাকা এবং মোট বিক্রি করেছেন ১,৮৬,২৫০ টাকা। এতে মনির হোসেনের লাভ দাঁড়ায় ৯১,৬৬৫ টাকা।

অন্যদিকে মো. কামরুল তার ক্যাপসিকাম চাষে বিভিন্ন খাতে ব্যয় করেছেন ১,৮৮,১২০ টাকা এবং মোট ফসল বিক্রি করেছেন ৬,১২,০০০ টাকা। এতে মো. কামরুলের লাভ দাঁড়ায় ৪,২৩,৮৮০ টাকা। মনির হোসেন ৭২ শতক জমিতে চিচিঙ্গা চাষ করে এবং মো. কামরুল ৬০ শতক জমিতে ক্যাপসিকাম চাষ করে বিভিন্ন খাতে যে টাকা ব্যয় করেছেন এবং তাদের উৎপাদিত ফসল বিক্রি করে যে টাকা পেয়েছেন তা নিম্নের দুটি তালিকায় আলাদা আলাদা ভাবে দেখানো হলো। তালিকা দু'টিতে দুটি ফসলের একর প্রতি খরচ ও আয়ের পরিমাণ হিসাব করে দেখানো হলো।

২০২৩ সালে মনির হোসেনের চিচিঙ্গা চাষের আয় ব্যয়ের হিসাব

ক্র. নং	খরচের বিবরণী	মোট খরচ (টাকা) ৭২ শতাংশ জমিতে	একর প্রতি খরচ (টাকা)	বিক্রয় মূল্য	একর প্রতি বিক্রয় মূল্য	লাভের পরিমাণ নিজস্ব জমি থেকে/ একর প্রতি
১.	ট্রাক্টরের মাধ্যমে চাষ	১২,৫০০	১৭,৩৬১	১,৮৬,২৫০	২,৫৮,৬৮১	লাভের পরিমাণ ৯১,৬৬৫ টাকা যা একরে হবে ১,২৭,৩১২ টাকা।
২.	সার বাবদ সর্বমোট মূল্য	২৬,৫৯৫	৩৬,৯৩৮			
৩.	বীজের মূল্য	১৬,২০০	২২,৫০০			
৪.	সেচ	২,৪০০	৩,৩৩৩			
৫.	সূতা	২,২০০	৮,৪৮৮			
৬.	মোট শ্রম মূল্য	২২,২০০	৩০,৮৩৩			
৭.	কীটনাশক	৯,৭৯০	১৩,৫৯৭			
৮.	ফসল বাজারে নিয়ে যাবার গাড়ি ভাড়ার খরচ	২,৭০০	৩,৭৫০			
	সর্বমোট	৯৪,৫৮৫	১,৩৬,৮০০	১,৮৬,২৫০	২,৫৮,৬৮১	৯১,৬৬৫

* খরচের বিবরণীর সর্বমোট মূল্যে নিজস্ব শ্রম ২০,০০০ টাকা যোগ করা হয় নি।

মো. কামরুলের ক্যাপসিকাম চাষে আয়-ব্যয়ের হিসাব

ক্র. নং	খরচের বিবরণী	মূল্য (টাকা)	একর প্রতি খরচ (টাকা)	বিক্রয় মূল্য	একর প্রতি বিক্রয় মূল্য	লাভ/ক্ষতি
১.	ট্রাক্টরের মাধ্যমে চাষ	১৫,০০০	২৫,০০০	৬,১২,০০০	১০,২০,০০০	লাভের পরিমাণ ৪,২৩,৮৮০ টাকা যা একরে হিসাব করলে হবে ৭,০৬,৪৬৯ টাকা।
২.	সার বাবদ সর্বমোট মূল্য	৫০,৮৪০	৮৪,৭৩৩			
৩.	চারার মূল্য	৫২,৫০০	৮৭,৫০০			
৪.	চারা নিয়ে আসার জন্য পরিবহন খরচ	৮০০	১,৩৩৩			
৫.	সেচ	২,৫০০	৪,১৬৬			
৬.	সূতা	৬,৫০০	১০,৮৩৩			
৭.	মোট শ্রম মূল্য	৪৭,৩৫০	৭৮,৯১৬			
৮.	কীটনাশক	১২,৬৩০	২১,০৫০			
	সর্বমোট	১,৮৮,১২০	৩,১৩,৫৩১	৬,১২,০০০	১০,২০,০০০	৪,২৩,৮৮০

* খরচের বিবরণীর সর্বমোট মূল্যে নিজস্ব শ্রম ৪৫,০০০ টাকা যোগ করা হয় নি।

উপসংহার

এই নিবন্ধটির শুরুতে আমরা উল্লেখ করেছি যে সিদীপের দুইজন কৃষকের দুইটি প্লটে ২৭ মাস ধরে (এপ্রিল ২০২২-জুন ২০২৪) যে সকল ফসল আবাদ করা হয়েছে তার প্রত্যেকটি ফসলের চাষ পদ্ধতি, উৎপাদনের হার ও আয়-ব্যয় সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য আমরা সংগ্রহ করেছি এবং তা ধারাবাহিকভাবে শিক্ষালোকে প্রকাশ করে আসছি। বর্তমান সংখ্যায় ৪র্থ পর্বে এই দু'জন কৃষকের একজন মনির হোসেন জুন ২০২৩ পর্যন্ত (প্রায় ২৬ মাস) ৪টি ফসলের এবং অন্যজন মো. কামরুল অক্টোবর ২০২৩ পর্যন্ত (প্রায় ২০ মাস) ৩টি ফসলের আবাদ করেছেন। উপসংহারে এ পর্যন্ত চাষকৃত এসকল ফসলাদি সম্পর্কে তিনটি বিষয়ের সারাংশ নিয়ে আলোচনা করব। যথা ০১। আবাদকৃত ফসল সমূহের উৎপাদন ২। আয়-ব্যয় এবং ৩। জমি ব্যবহার।

উৎপাদন: উল্লেখিত সময়ে মনির হোসেন তার ৭২ শতক প্লটে ৪টি ফসল যথা গ্রীষ্মকালীন টমেটো, ধনিয়া পাতা, করল্লা ও চিচিঙ্গা চাষ করেছেন। টানা বৃষ্টির কারণে তার গ্রীষ্মকালীন টমেটো নষ্ট হয়ে যাওয়ার ফলে মৌসুম পূর্ণ করতে পারেন নি এবং ১৫২ দিন (৫ মাস) পর ফসল তুলে ফেলতে হয়। তাই তিনি পূর্ণ মাত্রায় ফলন পান নি। তিনি ৭২ শতক জমিতে পেয়েছেন ৪,৯৯০ কেজি টমেটো যা একর প্রতি দাঁড়ায় ৬,৯৩০ কেজি। অন্যদিকে মো. কামরুল তার ৬০ শতক জমিতে ২১৯ দিন (৭ মাসেরও বেশী) মাঠে রেখে ২০ নভেম্বর পর্যন্ত গ্রীষ্মকালীন টমেটো তুলতে পেরেছেন। তাতে তিনি ফলন পেয়েছেন ৭,১৮৭ কেজি যা একরে রূপান্তর করলে দাঁড়ায় ১১,৯৭৬ কেজি। গ্রীষ্মকালীন টমেটো নষ্ট হয়ে যাওয়ার পর মনির হোসেন স্বল্প মেয়াদী ধনিয়া পাতার চাষ করেন। মাত্র ৩২ দিন পর এখান থেকে তিনি ৩,০৩১ কেজি ধনিয়া পাতা উৎপাদন করেন যে সময়টাতে মো. কামরুলের জমিতে গ্রীষ্মকালীন টমেটো চাষ হচ্ছিল। ধনিয়া পাতা চাষের পর মনির হোসেন ঐ জমিতে করল্লার চাষ করেন। ১৫৩ দিন পর তিনি করল্লা চাষ শেষ করেন। এতে তিনি ফলন পান ৪,৬৯৪ কেজি যার একর প্রতি ফলন দাঁড়ায় ৬,৫১৯ কেজি। করল্লা চাষ পরবর্তীতে মনির হোসেন তার জমিতে ৭ দিনের গ্যাপ দিয়ে ২০২৩ সালের ২৫ শে এপ্রিল চিচিঙ্গা চাষ শুরু করেন এবং চিচিঙ্গার উৎপাদন কার্যক্রম শেষ হয় ১৫ জুলাই, ২০২৩। এতে তিনি ফলন পান ৫,০১৪ কেজি যার একর প্রতি ফলন দাঁড়ায় ৬,৯৬৪ কেজি। অন্যদিকে গ্রীষ্মকালীন টমেটো চাষ শেষে মো. কামরুল দীর্ঘদিন তার জমি ফেলে রাখেন। প্রায় ১১৫ দিন (প্রায় ৪ মাস) পর তিনি ক্যাপসিকাম ফসলের চাষ শুরু করেন । দুর্ভাগ্যবশত ফলন আসার আগে ৫১ দিন পর বৃষ্টিতে তার ক্যাপসিকাম ফসলের সকল গাছ নষ্ট হয়ে যায় এবং তা থেকে তিনি কোন উৎপাদন পান নি। এর ১৯ দিন পরে ২০২৩ সালের ২৫ মে তিনি পুনরায় ক্যাপসিকাম চাষাবাদ শুরু করেন যা ২৪ অক্টোবর ২০২৩ সম্পন্ন হয়। এতে তিনি ফলন পান ৬,০০০ কেজি যার একর প্রতি ফলন ১০,০০০ কেজি। নীচের তালিকায় দু'জন কৃষকের চাষকৃত ফসলের নাম, মোট উৎপাদনের পরিমাণ এবং তা একর প্রতি হারে রূপান্তর করে দেখানো হলো।

মনির হোসেনের চাষকৃত ফসলের ফলন

ফসলের নাম	প্লটে (৭২ শতাংশ) ফলনের পরিমাণ কেজি)	একর প্রতি ফলন (কেজি)
গ্রীষ্মকালীন টমেটো	৪,৯৯০	৬,৯৩০
ধনিয়া	৩৩১	৪,৩৭২
করল্লা	৪,৬৯৪	৬,৫৯১
চিচিঙ্গা	৫,০১৪	৬,৯৬৪

মো: কামরুলের চাষকৃত ফসলের ফলন

ফসলের নাম	প্লটে (৭২ শতাংশ) ফলনের পরিমাণ কেজি)	একর প্রতি ফলন (কেজি)
গ্রীষ্মকালীন টমেটো	৭,১৮৭	১১,৯৭৮
ক্যাপসিকাম	৬,০০০	১০,০০০

আয়-ব্যয়ের হিসাব: উল্লেখিত সময়ে মনির হোসেন গ্রীষ্মকালীন টমেটো, ধনিয়া পাতা, করল্লা ও চিচিঙ্গা চাষ করে মোট ব্যয় করেছেন ৬,২৬,২১৮ টাকা এবং উৎপাদিত ফসল বিক্রি করে পেয়েছেন ৯,৫৬,১৩১ টাকা। ফলে তার লাভ দাঁড়িয়েছে ৩,২৯,৯১৩ টাকা। বৃষ্টির কারণে ফসল নষ্ট না হলে তার লাভ আরও বেশী হত। অন্যদিকে মো. কামরুল গ্রীষ্মকালীন টমেটো চাষের পর জমি ফেলে রেখেছেন অনেকদিন। তারপরে ক্যাপসিকাম চাষ করলেও তার ক্যাপসিকাম ফসল পুরোটা বৃষ্টিতে নষ্ট হয়ে যায় কোন ফল আসার আগেই। পুনরায় তিনি ক্যাপসিকাম চাষ করেছেন এবং ক্যাপসিকাম চাষ করে তিনি ৪,২৩,৮৮০ টাকা লাভ করেছেন। মো. কামরুল এ পর্যন্ত ৩টি ফসল (গ্রীষ্মকালীন টমেটো ও ২ বার ক্যাপসিকাম) চাষ করে মোট খরচ হয়েছে ৬,৮২,৫৫০ টাকা এবং ফসল বিক্রি করে পেয়েছেন ১৩,২৫,৭৫০ টাকা। এর ফলে তার নীট লাভ দাঁড়িয়েছে ৬,৪৩,৭০০ টাকা।

মনির হোসেনের আয়-ব্যয়ের হিসাব

ফসলের নাম	৭২ শতাংশ জমিতে মোট খরচের পরিমাণ (টাকা)	মোট বিক্রির পরিমাণ (টাকা)	লাভ বা ক্ষতির পরিমাণ (টাকা)
গ্রীষ্মকালীন টমেটো	৩,৬৪,৮৬০	৪,০৩,৪৮০	৩৮,৬২০
ধনিয়া	৪৪,৫২৮	১,৩৭,৬৫১	৯৩,১২৩
করল্লা	১,২২,২৪৫	২,২৮,৭৫০	১,০৬,৫০৫
চিচিঙ্গা	৯৪,৫৮৫	১,৮৬,২৫০	৯১,৬৬৫
মোট	৬,২৬,২১৮	৯,৫৬,১৩১	৩,২৯,৯১৩

মো: কামরুলের আয়-ব্যয়ের হিসাব

ফসলের নাম	৭২ শতাংশ জমিতে মোট খরচের পরিমাণ (টাকা)	মোট বিক্রির পরিমাণ (টাকা)	লাভ বা ক্ষতির পরিমাণ (টাকা)
গ্রীষ্মকালীন টমেটো	৩,৮৫,২৭৬	৭,১৩,৭৫০	৩,২৮,৪৭৪
ক্যাপসিকাম	১,০৮,৬৫৪	-	-১,০৮,৬৫৪
ক্যাপসিকাম	১,৮৮,৬২০	৬,১২,০০০	৪,২৩,৮৮০
-	-	-	-
মোট	৬,৮২,৫৫০	১৩,২৫,৭৫০	৬,৪৩,৭০০

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে এই দেড় বছরে (১৬-১৯ মাসে) মনির হোসেন ৪টি ফসল আবাদ করে নীট লাভ হয়েছে ৩,২৯,৯১৩ টাকা। আর মো. কামরুল ৩টি (বাস্তবে ২টি) ফসল আবাদ করে মোট নীট লাভ হয়েছে ৬,৪৩,৭০০ টাকা। নীচের তালিকায় মনির হোসেন ও মো. কামরুলের প্লট দু'টিতে বিভিন্ন ফসলের খরচ ও লাভের পরিমাণ এবং তা একরে রূপান্তর করে দেখানো হলো।

জমি ব্যবহারের হিসাব: এবারে জমির ব্যবহারের হিসাব দেখা যাক। আমরা দু'জন কৃষকের জমি ব্যবহারের হিসাব শুরু করেছিলাম মধ্য এপ্রিল ২০২২ থেকে যখন দু'জন কৃষকই গ্রীষ্মকালীন টমেটো চাষ শুরু করেছিলেন। এ পর্বে মনির হোসেনের ৪র্থ ফসল চিচিঙ্গা কাটা শেষ হয় ২৪ জুলাই ২০২৩ এ। এই হিসেবে মোট দিনের সংখ্যা হয় ৪৬৮ দিন। এর মধ্যে ৪টি ফসল আবাদ ছিল ৪১৯ (৮৯.০%) দিন এবং প্লটটি খালি ছিল ৪৯ (১১.০%) দিন। অন্যদিকে মো. কামরুলের সর্বশেষ ফসল ক্যাপসিকাম কাটা শেষ হয় ২৪ অক্টোবর ২০২৩ তারিখে। সে হিসেবে মোট দিনের সংখ্যা হয় ৫৭৩ দিন। এর মধ্যে ৩টি ফসলে আবাদ ছিল ৪২৩ (৭৪.০%) দিন এবং প্লটটি খালি ছিল ১৫০ (২৬.০%) দিন। (নিচের তালিকা দেখুন)

মনির হাসেনের ক্ষেত্রে জমি ব্যবহারের সময়কাল

ক্রম	ফসলের নাম	ফসল জমিতে থাকার সময় (তারিখ)	জমিতে ফসল থাকার সময় (দিন)	জমি খালি থাকার সময় (তারিখ)	জমি খালি থাকার সময় (দিন)
১.	গ্রীষ্মকালীন টমেটো	১৬.০৪.২০২২ - ১৪.০৯.২০২২	১৫২	১৫.০৯.২০২২ - ০৯.১০.২০২২	২৫
২.	ধনিয়া	১০.১০.২০২২ - ১০.১১.২০২২	৩২	১১.১১.২০২২ - ১৫.১১.২০২২	৫
৩.	করল্লা	১৬.১১.২০২২ - ১৭.০৪.২০২৩	১৫৩	১৮.০৪.২০২৩ - ২৪.০৪.২০২৩	৭
৪.	চিচিঙ্গা	২৫.০৪.২০২৩ - ১৫.০৭.২০২৩	৮২	১৬.০৭.২০২৩ - ২৭.০৭.২০২৩	১২
মোট			৪১৯		৪৯

মো. কামরুলের ক্ষেত্রে জমি ব্যবহারের সময়কাল

ক্রম	ফসলের নাম	ফসল জমিতে থাকার সময় (তারিখ)	জমিতে ফসল থাকার সময় (দিন)	জমি খালি থাকার সময় (তারিখ)	জমি খালি থাকার সময় (দিন)
১.	গ্রীষ্মকালীন টমেটো	১৬.০৪.২০২২ - ২০.১১.২০২২	২১৯	২১.১১.২০২২ - ১৫.০৩.২০২৩	১১৫
২.	ক্যাপসিকাম	১৬.০৩.২০২৩ - ০৫.০৫.২০২৩	৫১	০৬.০৫.২০২৩ - ২৪.০৫.২০২৩	১৯
৩.	ক্যাপসিকাম	২৫.০৫.২০২৩ - ২৪.১০.২০২৩	১৫৩	২৫.১০.২০২৩ - ০৯.১১.২০২৩	১৬
মোট			৪২৩		১৫০

কয়েকটি মন্তব্য

- নিবন্ধটির ২য় পর্বে গ্রীষ্মকালীন টমেটো চাষের বর্ণনা শেষে আমরা মন্তব্য করেছিলাম যে, ফসল চাষের উপর বাংলাদেশের কৃষকদের জন্য যখন কোন প্রশিক্ষণ আয়োজন করা হয় (যারাই করেন না কেন) তখন যদি যে ফসল বা একাধিক ফসলের উপর প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে সে সকল ফসলাদি যারা চাষ করবেন শুধু তাঁদেরকেই বাছাই করে নির্বাচন করা হয় এবং প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয় তাহলে প্রশিক্ষণটি অধিকতর কার্যকর ও ফলপ্রসূ হবার সম্ভাবনা থাকবে।

- দু'জন কৃষকের ফসল নির্বাচনের ক্ষেত্রে প্রচণ্ড পার্থক্য লক্ষ্য করা গেছে। এই দেড় বছরে মনির হোসেন ৪টি ফসলের চাষ করেছেন। তার মধ্যে ১টি ফসল (গ্রীষ্মকালীন টমেটো) উচ্চ মূল্যের ফসল ও বাকি ৩টি সাধারণ সবজি। অন্যদিকে মো. কামরুল গ্রীষ্মকালীন টমেটো চাষের পর আর একটি উচ্চ মূল্যের ফসল ক্যাপসিকাম এর চাষ করেন। মজার ব্যাপার হলো ক্যাপসিকাম ফসলটি প্রায় ৫১ দিন মাঠে থাকার পর এবং এর জন্য প্রায় এক লক্ষ টাকা খরচ হওয়ার পর ফসলটি বৃষ্টির কারণে পুরোপুরি ভেস্তে গেলেও মো. কামরুল সেই প্লটে পুনরায় ক্যাপসিকাম ফসলেরই চাষ করার সিদ্ধান্ত নেন।

- এটা খুব তাৎপর্যপূর্ণ যে মনির হোসেন তার ৭২ শতক জমিতে ৪টি ফসল চাষ করে মোট ব্যয় করেছেন ৬.২৬ লক্ষ টাকা এবং মো. কামরুল ৬০ শতক জমিতে ৩টি ফসলের চাষ করে মোট খরচ করেছেন ৬.৮৩ লক্ষ টাকা কিন্তু মনির হোসেন লাভ করেছেন সর্বমোট ৩.৩০ লক্ষ টাকা আর মো. কামরুল লাভ করেছেন ৬.৪৩ লক্ষ টাকা; প্রায় দ্বিগুণের কাছাকাছি।

- দু'জন কৃষকের মধ্যে ঘটনাচক্রে মো. কামরুল প্রায় ১০ বছর কুয়েতে প্রবাস জীবন কাটিয়েছেন একজন শ্রমিক হিসেবে কাজ করে। এর মধ্যে একটি বড় আকারের কৃষি খামারে কাজ করেছেন প্রায় ৪ বছর। তিনি সেখানে কাজ করে অর্থ উপার্জনের পাশাপাশি ফসল উৎপাদনের উন্নত প্রযুক্তি সম্পর্কেও জ্ঞান লাভ করেন। দেশে ফিরে এসে যখন তিনি তার নিজস্ব জমিতে চাষাবাদ শুরু করেছেন তখন তিনি তার অর্জিত জ্ঞানকে কাজে লাগাতে চেষ্টা করেছেন। তার ফসল নির্বাচন, গ্রীষ্মকালীন টমেটোকে বৃষ্টির পানি থেকে রক্ষা করা, অধিক হারে উৎপাদনে লাভ করা ইত্যাদি তার প্রমাণ। তাই দেশের যে সকল শ্রমিক প্রবাস জীবনে উন্নত প্রযুক্তি বিষয়ে বিশেষ করে কৃষি প্রযুক্তি বিষয়ে জ্ঞান লাভ করে দেশে এসে কাজ করছেন তাদের সেই জ্ঞানকে কিভাবে বৃহত্তর পরিসরে বিস্তৃত আকারে কাজে লাগানো যায় তার উদ্যোগ গ্রহণ করলে অনেক মানুষ উপকৃত হবে।

এরপর মনির হোসেন তার জমিতে মরিচ ও ঢেঁড়সের চাষ করেন এবং মো. কামরুল চাষ করেন মরিচ। এরই বৃত্তান্ত আগামী পর্বে ছাপা হবে।

চাঁদপুরে শোল্লা স্কুল অ্যান্ড কলেজে মুক্তপাঠাগার উদ্বোধন

স্কুল-কলেজের শিক্ষার্থীদের বই পড়ার প্রতি আগ্রহী করে তোলা এবং তাদের মধ্যে পাঠাভ্যাস গড়ে তোলার লক্ষ্যে ৩০ আগস্ট ২০২৬ তারিখে সিদীপের চাঁদপুর ফরিদগঞ্জ ব্রাঞ্চের শোল্লা স্কুল অ্যান্ড কলেজে 'মোহাম্মদ ইয়াহিয়া মুক্তপাঠাগার' উদ্বোধন করা হয়। মুক্তপাঠাগারটির উদ্বোধন করেন শোল্লা স্কুল অ্যান্ড কলেজের অধ্যক্ষ জনাব মো. আরিফুর রহমান। এ উদ্বোধন অনুষ্ঠানে বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকা ও শিক্ষার্থীবৃন্দ ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন সিদীপের চাঁদপুর এরিয়া ম্যানেজার, ফরিদগঞ্জ ব্রাঞ্চের ম্যানেজার, শিক্ষা সুপারভাইজার এবং প্রধান কার্যালয় থেকে আগত গবেষণা ও প্রকাশনা কর্মকর্তা। শিক্ষার্থীদের মাঝে বই পড়ার অভ্যাস গড়ে তোলা এবং তাদের বইমুখী করে তোলার এই উদ্যোগ

ভবিষ্যতেও অব্যাহত থাকবে। মুক্তপাঠাগারটি শিক্ষার্থীদের নিয়মিত বই পড়ার সুযোগ তৈরি করবে এবং তাদের জ্ঞান ও চিন্তার জগৎকে আরও সমৃদ্ধ করবে, এমনটাই প্রত্যাশা।

অভিযোগের কাঠগড়ায় শিক্ষক, বিচারকের ভূমিকায় শিক্ষার্থী-অভিভাবক

সমাজ ও রাষ্ট্রের জন্য অশনিসংকেত

মনিরুল ইসলাম শ্রাবণ

দেশের নানা স্থানে প্রায় সময় শিক্ষকদের উপর নির্যাতন-নিপীড়নের ঘটনার খবর প্রকাশিত হয়। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে নানা ছবি ও ভিডিও। সম্প্রতি এরকম একটা ভিডিও দেখলাম, একজন প্রধান শিক্ষককে মোড়া (বসার জন্য ব্যবহৃত প্লাস্টিক টুল) তুলে মারতে গিয়েছে একজন কিশোর। সেভেন-এইট পড়ুয়া শিক্ষার্থী। একটি আঘাতও করেছে সে। আকস্মিক ঘটনায় চেয়ার থেকে উঠে হাত দিয়ে নিজেকে রক্ষা করতে গিয়েও আঘাত প্রাপ্ত হলেন সেই শিক্ষক। ঘটনা কোন জায়গায়, কী কারণে এরকম বর্বরোচিত ঘটনা ঘটলো তার বিস্তারিত তথ্য কোনো সংবাদ মাধ্যমে এখনো চোখে পড়ল না। ফেসবুকে ছড়িয়ে পড়া ছোট্ট ভিডিওক্লিপে দেখা যায়, সমবয়সী অনেক শিক্ষার্থী প্রধান শিক্ষকের রুমে প্রবেশ করেছে। সেই সময় সেখানে আরো কিছু শিক্ষক অথবা অভিভাবক উপস্থিত ছিলেন। সম্ভবত কোনো বিষয় নিয়ে বা দাবি-দাওয়া নিয়ে কথা বলতে এসেছিল শিক্ষার্থীরা। এক পর্যায়ে উত্তেজিত হয়ে এক শিক্ষার্থী সামনে থাকা মোড়া নিয়ে প্রধান শিক্ষককে আঘাত করে। সে সময় একজন ব্যক্তি ওই শিক্ষার্থীকে সেখান থেকে দ্রুত বের করে দেয়। আরেকজন ব্যক্তি আক্রমণকারী শিক্ষার্থীকে আঙুল তুলে তিরস্কার করতে দেখা যায়। সেখানে আরো শিক্ষার্থীরা অনেকটা নীরবে দাঁড়িয়ে এই ঘটনা দেখল। কিন্তু তারা কোনো প্রতিবাদ করল না। বোঝা যাচ্ছে, তারা এই শিক্ষার্থীর এই কর্মকাণ্ডের নীরব সমর্থক। নীরবতার কারণ ভিডিও দেখে নিশ্চিতভাবে বোঝা না গেলেও তাদের সেই নীরবতা উদ্বেগজনক ছিল। কিছুদিন আগে আরেকটি ভিডিওতে দেখলাম, দুইজন অভিভাবক বাবা ও মা কথা কাটাকাটির এক পর্যায়ে শিক্ষিকার গায়ে হাত তুলেছে। তাও আবার স্কুলের শিক্ষকদের বসার জন্য নির্ধারিত অফিস কক্ষেই।

সাম্প্রতিক সময়ে শিক্ষক নির্যাতনের মারাত্মক একটি ঘটনা ঘটেছে ভৈরবে। দেশের বেশ কিছু সংবাদ মাধ্যমে প্রকাশিত সংবাদে জানা যায়, সিঁথি সীমিতা নামের এক কিন্ডারগার্টেন শিক্ষিকাকে ঘরের দরজা আটকে ধারালো দা দিয়ে নৃশংসভাবে কোপানো হয়েছে। হামলায় ওই শিক্ষিকার মাথায় ১০টি কোপ লেগেছে এবং তাঁর মাথায় প্রায় ৫০টি সেলাই দিতে হয়েছে। এছাড়া তাঁর হাতের আঙুল বিচ্ছিন্ন হওয়াসহ সারা শরীরে গুরুতর আঘাত লেগেছে। হামলার কারণ হিসেবে জানা যায়, শিক্ষিকা সিঁথি সীমিতা অভিযুক্ত প্রিয়া বেগমের ৪ বছরের সন্তানকে বাসায় গিয়ে পড়াতেন। পড়ানো শেষে টিউশনির বকেয়া টাকা চাওয়াকে কেন্দ্র করে ক্ষুব্ধ হয়ে প্রিয়া বেগম এই হামলা চালায়।

শিক্ষকরাও রক্ত-মাংসে গড়া মানুষ। তাই তাঁদেরও ভুল, সীমাবদ্ধতা ও বিচ্যুতি থাকতে পারে। লোভ-লালসা, রাগ-অভিমান, হিংসা-বিদ্বেষ, ক্রোধ-শ্লেষ থাকতে পারে। ফলে শিক্ষকদের থেকেও অনেক সময় নানা ধরনের ছোট-বড় ভুল বা অন্যায় হয়ে থাকে। তাই আমরা দেখি শিক্ষকদের দ্বারা ছাত্রছাত্রী অতিরিক্ত মারধরের শিকার হয়। স্কুলের বেতন না দেওয়া, বাড়ির কাজ ঠিকমতো না করে আনা, ক্লাসে পড়া না পারা, স্কুল ড্রেস পরে না আসা, চুল-নখ না কাটার কারণে অথবা শিক্ষার্থীদের অন্য কোনো ভুল-ত্রুটির কারণে প্রয়োজনের অতিরিক্ত শাসন করেন। অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে তাদের নির্ধারিত দোকান থেকে বই-গাইড, স্কুল ড্রেস, ব্যাগ, খাতা-কলম ইত্যাদি না কেনার কারণেও শিক্ষকরা ছাত্র ছাত্রী অথবা তাদের অভিভাবকদের সাথে দুর্ব্যবহার করেন। এসব নানা কারণে শিক্ষকরা ছাত্রদের উপর নির্যাতন করেন। এতে ক্ষুব্ধ ছাত্রছাত্রী এবং অভিভাবকরা শিক্ষকদের উপর গালিগালাজ, শারীরিক নির্যাতনের ঘটনা ঘটিয়ে বসেন। এছাড়া শিক্ষক-শিক্ষিকা কর্তৃক ছাত্র ছাত্রীদের উপর যৌন নির্যাতনের মতো মারাত্মক ঘটনার অভিযোগও আমাদের দেশে আছে। ক্লাসের রাজনৈতিক বা ধর্মীয় অবমাননাকর বক্তব্যের কারণেও অনেক সময় শিক্ষার্থী ও এলাকাবাসী শিক্ষকদের উপর চড়াও হয়।

শিক্ষকদের নানা অন্যায়, অপরাধ, বিচ্যুতি মাথায় রেখেই বলছি, তাদের বিভিন্ন অপরাধের জন্য আইনগত ব্যবস্থা নেওয়ার অনেক সুযোগ আছে। বিদ্যালয় পরিচালনা কমিটি আছে, জেলা উপজেলায় শিক্ষা বিষয়ক কার্যালয় এবং কর্মকর্তা আছে। স্থানীয় প্রশাসন আছে, সরকার আছে, মন্ত্রণালয় আছে। সর্বোপরি, অপরাধের ধরন অনুযায়ী আইন-আদালতে অভিযোগ দেওয়ার ব্যবস্থা আছে। বিচার করার এতসব কার্যালয় বা ব্যক্তি থাকা সত্ত্বেও একজন ছাত্র-ছাত্রী কিংবা অভিভাবক কেনো শিক্ষকদের উপর হামলা করবে? কোনো শিক্ষকদের বিচারের দায় নিজের হাতে নেবে? অনেক ঘটনা ভাইরাল হওয়ার পর জানা যায়,

বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই খুব সামান্য কারণেই শিক্ষকরা নির্যাতনের শিকার হচ্ছেন। নিজ ক্লাসে, নিজ শ্রেণিকক্ষে, অফিস কক্ষে, রাস্তা-ঘাটে এমনকি নিজেদের বাসায় নির্যাতনের শিকার হচ্ছেন। মিথ্যা অভিযোগে বা সামান্য অপরাধের মিথ্যা মামলায় কারাবরণের ঘটনাও ঘটেছে। বেশ কয়েকজন শিক্ষক ছাত্র অভিভাবক কর্তৃক হামলার শিকার বা মৃত্যুবরণ করার ঘটনাও ঘটেছে। আর ২৪ এর গণ-আন্দোলনের পর সারা দেশে যেভাবে মব সৃষ্টি করে শিক্ষকদের পদত্যাগ করতে বাধ্য করা ও লাঞ্ছনার শিকার হতে হয়েছে, সেসব কথা তো সবারই জানা।

শিক্ষা জাতির মেরুদণ্ড, শিক্ষকগণ মানুষ তথা দেশ গড়ার কারিগর। জাতির বিবেক, ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি ধারক এবং বাহক একজন শিক্ষক। স্নেহ-ভালোবাসা, মায়া-মমতা, ন্যায়-নীতির শিক্ষাসহ পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রের প্রতি দায়িত্ববোধের শিক্ষা দেন একজন শিক্ষক। সেই শিক্ষকদের বর্তমান সময়ে যেভাবে নির্যাতন-নিপীড়ন করা হচ্ছে, তা মোটেও কাম্য নয়। যেখানে আইনি ব্যবস্থা নেওয়ার সুযোগ আছে, সেখানে একজন ছাত্র নিজেই কেনো বিচারকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হচ্ছে? একজন অভিভাবক নিজেই কেন শিক্ষকের বিচারের দায়িত্ব নিচ্ছেন?

শিক্ষকতা পেশা হিসেবেই নয়, রাষ্ট্রের নিয়োজিত একজন কর্মচারী হিসেবেও রাষ্ট্র তাঁদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করাসহ এবং রাষ্ট্রীয় কাজে বাধা প্রদান করে সংশ্লিষ্ট শিক্ষার্থী এবং অভিভাবকদের শাস্তির আওতায় নিয়ে আসা উচিত। এবং এসব শাস্তির ঘটনাগুলো ফলাও করে সংবাদমাধ্যম এবং সোশ্যাল মিডিয়াতে প্রচার করা উচিত। যেন ভবিষ্যতে এমন কোনো ঘটনা ঘটাতে অন্যরা সাহস না পায়। অপরদিকে যারা শিক্ষক হয়েও নানা ধরনের অন্যায়-অপরাধ করেন বা শিক্ষার্থীদের সামান্য কারণে শাস্তি দেন কিংবা শিক্ষার্থীদের কোনো যৌক্তিক দাবি পূরণ করতে ব্যর্থ হন, তাদের অপরাধের ধরন অনুযায়ী শাস্তি হওয়া প্রয়োজন এবং সেই শাস্তির কথা দেশবাসীকে জানিয়ে দেওয়া প্রয়োজন। এটা করে শিক্ষার্থী এবং অভিভাবকদের রাষ্ট্র এবং রাষ্ট্রীয় আইনের প্রতি আস্থা, বিশ্বাস এবং ইতিবাচক ধারণা তৈরি হবে। ফলে শিক্ষকের উপর নির্যাতন করা তো দূরের কথা, দোষী শিক্ষকের বিচার করার দায়িত্বও নিজের হাতে কেউ তুলে নেবে না।

দেশে এ পর্যন্ত ঘটা বিভিন্ন ঘটনায় দোষী ছাত্র-ছাত্রী, অভিভাবক এবং শিক্ষকদের চিহ্নিত করে শাস্তি নিশ্চিত না করা হলে, ভবিষ্যতে অনেকেই শিক্ষকতা পেশায় আসতে বারবার ভাববেন বা আসবেন না। দেশে এত স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা থাকার পরেও যেখানে নৈতিক মূল্যবোধ সম্পন্ন মানুষ তৈরি করা যাচ্ছে না সেখানে সে দেশে শিক্ষক সংকট তৈরি হলে দেশ কতটা অমানুষের দেশে পরিণত হবে- তা ভাবার সময় এখনই।

বর্তমান প্রজন্মের একটি দৃশ্যমান অংশের মধ্যে উদ্বেগজনক আচরণগত অবক্ষয় লক্ষ্য করা যাচ্ছে। কিশোরগ্যাং কালচার, প্রকাশ্যে সিগারেট খাওয়া, মেয়েদের টিজ করা বর্তমান প্রজন্মের কাছে সাধারণ বিষয়। মুরুব্বি বা বড়দের দেখে সংযত কথাবার্তা বা আচরণ না করার অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছে যে, বেয়াদবিকে তারা বেয়াদবিই মনে করছে না। এরা পরস্পরের সাথে কথা বলে নোংরা ভাষায়। সোশ্যাল মিডিয়ায় নোংরা ইঙ্গিতপূর্ণ পোস্ট এবং মন্তব্য করে। অশালীন অঙ্গভঙ্গি করে ভিডিও প্রকাশ করে অনেকটা নির্ভয়ে।

একটা প্রজন্মের উল্লেখযোগ্য অংশের এরকম নৈতিক অধঃপতন নিয়ে সমাজ ও রাষ্ট্রকে ভাবতে হবে এবার। একথা ঠিক যে, সব শিক্ষার্থী খারাপ নয় বা এই প্রজন্মের সবাই উচ্ছন্নে যায়নি। কিন্তু যারা গিয়েছে তারা সমাজে ব্যাপক নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে এবং ভালো ছাত্রছাত্রী ও ভালো মানুষের জীবনকে বিষিয়ে তুলছে।

শিক্ষা জাতির মেরুদন্ড, শিক্ষাই সুখের মূল, শিক্ষাগুরুর মর্যাদা অপরিসীম। শিক্ষার্থীদের নৈতিকবোধসম্পন্ন করতে না পারলে শুধু বই-পুস্তকের জ্ঞান বা প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা দিয়ে একটি আদর্শ প্রজন্ম গড়ে তোলা সম্ভব হবে না। একটি জাতির নৈতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক ভিত্তি গড়ে ওঠে শিক্ষার ওপর; আর সেই ভিত্তি নির্মাণে শিক্ষকের ভূমিকা অনস্বীকার্য। কাজেই 'আজ থেকে চির উন্নত হল শিক্ষাগুরুর শির' এই মন্ত্রে দীক্ষিত না হলে আমাদের সম্ভব হবে না একটি আদর্শ সমাজ ও রাষ্ট্র গড়ে তোলা।

সুতরাং শিক্ষার্থীদের মেধার মান উন্নয়নের পাশাপাশি তাদের নৈতিক মান উন্নয়ন ও মানবিক গুণাবলির বিকাশের উপায় নিয়েও আমাদের ভাবতে হবে। অভিভাবক এবং শিক্ষকদের মধ্যে সুসম্পর্ক বজায় রাখার কৌশল নিয়ে আমাদের ভাবতে হবে। কোন অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা ঘটলে কি উপায় তার সহজ ও শান্তিপূর্ণ সমাধান হবে, সে সব বিষয়ে সবাইকে সচেতন করতে হবে। ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক এবং অভিভাবকদের একটি সুন্দর, সম্মানজনক সম্পর্ক গড়ে তুলতে পারলেই তবেই আমরা একটি আদর্শ শিক্ষা ব্যবস্থা, একটি আদর্শ প্রজন্ম, সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থা গড়ে তুলতে পারব।

লেখক: কবি ও সাংস্কৃতিক সংগঠক

প্রতিটি টাকার গল্প

মো. মামুন

একসময় আমি ভাবতাম, আমার পেশার পরিচয় খুব সহজ– সংখ্যা নিয়ে কাজ করা। সারাদিন ব্যালেন্স শিট, আয়-ব্যয়ের হিসাব, বাজেট, নগদ প্রবাহ, নিরীক্ষা, কর, ভ্যাট, আর নানান ধরনের আর্থিক বিশ্লেষণ। দিনের শেষে সব সংখ্যা ঠিকঠাক মিললে মনে হতো আজকের কাজ শেষ। কিন্তু জীবনের গল্পের যতো গভীরে প্রবেশ করেছি, মানুষের বাস্তবতাকে যতো কাছ থেকে দেখেছি, ততোই একটি সত্য আমাকে নীরবে স্পর্শ করেছে; টাকা কখনোই শুধু টাকা নয়। প্রতিটি টাকার একটি গল্প আছে।

আমরা যাকে একটি লেনদেন বলি, অনেক সময় সেটিই কারও জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্ত। বাংলাদেশের কোনো গ্রামের এক কৃষক যখন বীজ কেনার জন্য একটি ক্ষুদ্রঋণ পান, আমাদের হিসাবের খাতায় সেটি হয়তো একটি Loan Disbursement। কিন্তু তাঁর কাছে সেটি নতুন মৌসুমের প্রথম বৃষ্টির মতো–একটি পরিবারের ভবিষ্যৎ; সন্তানের মুখে হাসি; আর আগামী দিনের আশার শুরু।

একজন নারী যখন একটি সেলাই মেশিন কেনার জন্য মূলধন পান, কাগজে-কলমে সেটি একটি আর্থিক সহায়তা। বাস্তবে সেটিই হয়ে ওঠে তাঁর আত্মমর্যাদা ফিরে পাওয়ার প্রথম ধাপ। হয়তো সেই আয়ই তার সন্তানের স্কুলের ভর্তি ফি জমা হয়, বৃদ্ধ মায়ের ওষুধ কেনা হয়, কিংবা বহুদিনের অসমাপ্ত একটি স্বপ্ন পূরণের পথ খুলে যায়।

একটি প্রতিষ্ঠানে মাসের শেষে যখন কর্মীদের বেতন সময়মতো ব্যাংক হিসাবে পৌঁছে যায় তখন অনেকেই সেটিকে একটি নিয়মিত Payroll Process হিসেবে দেখেন। কিন্তু সেই বেতনের ভেতর লুকিয়ে থাকে অসংখ্য অদেখা গল্প। কেউ সেই অর্থ দিয়ে বাসা ভাড়া দেন, কেউ বাবার চিকিৎসার বিল পরিশোধ করেন, কেউ সন্তানের বিশ্ববিদ্যালয়ের সেমিস্টার ফি জমা দেন, কেউ হয়তো বহুদিন পর পরিবারের জন্য নতুন পোশাক কিনে বাড়ি ফেরেন। একটি সংখ্যার আড়ালে এভাবেই বেঁচে থাকে অগণিত মানুষের জীবন।

তবে প্রতিটি গল্প সুখের হয় না। একটি ভুল আর্থিক সিদ্ধান্ত, একটি দুর্বল অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ, একটি অপ্রয়োজনীয় ব্যয়, কিংবা একটি বিলম্বিত পরিশোধ/অতিরিক্ত প্রদান এসবও গল্প লেখে। সেই গল্পে থাকে হারিয়ে যাওয়া সুযোগ, কমে যাওয়া আস্থা, থেমে যাওয়া কোনো উনয়ন প্রকল্প, কিংবা এমন কিছু মানুষের কষ্ট, যাদের মুখ আমরা কখনো দেখি না।

এ কারণেই আজ আমি বিশ্বাস করি, Finance-এর প্রকৃত কাজ শুধু হিসাব মেলানো নয়। Finance মানে বিশ্বাস রক্ষা করা, দায়িত্বের সঙ্গে সিদ্ধান্ত নেওয়া, সীমিত সম্পদকে এমনভাবে ব্যবহার করা, যাতে তার সর্বোচ্চ মূল্য সৃষ্টি হয়। একজন দক্ষ Finance Professional এর সাফল্য শুধু একটি সুন্দর Financial Statement বা একটি অজারবেশন

মুক্ত Audit Report-এ সীমাবদ্ধ নয়। তাঁর প্রকৃত সাফল্য লুকিয়ে থাকে সেইসব ইতিবাচক পরিবর্তনের মধ্যে, যা সঠিক আর্থিক সিদ্ধান্তের ফলে মানুষের জীবনে সৃষ্টি হয়।

আমরা সংখ্যা গুণি, কিন্তু মানুষ সংখ্যা মনে রাখে না। মানুষ মনে রাখে–কঠিন সময়ে কে পাশে ছিল, কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান তাদের আস্থা দিয়েছিল, আর কোন সিদ্ধান্ত তাদের জীবনের গতিপথ বদলে দিয়েছিল। তাই যখনই কোনো Financial Report খুলে বসি, কোনো বাজেট নিয়ে কাজ করি, কিংবা কোনো সংখ্যার পাশে স্বাক্ষর করি, তখন নিজের কাছে একটি প্রশ্ন আসে, এই টাকার গল্পটা কী? কারণ দিনের শেষে, টাকার মূল্য তার অঙ্কে নয়; তার মূল্য নির্ধারিত হয়; কতগুলো জীবনে সে ইতিবাচক পরিবর্তন আনতে পেরেছে তার উপর। তাই আজ আর আমি শুধু সংখ্যা দেখি না। আমার কাছে অর্থের ভাষা আর শুধু সংখ্যার ভাষা নয়; এটি মানুষের ভাষা, দায়িত্বের ভাষা, স্বপ্নের ভাষা। আমি সংখ্যার ভেতরে মানুষের স্বপ্ন দেখি। হিসাবের ভেতরে দেখি দায়িত্ব। আর প্রতিটি টাকার ভেতরে দেখি একটি জীবন্ত গল্প।

সেই অনুভূতিকে গদ্যে যতটা বলা যায়, তারও কিছু অংশ শব্দের সীমা ছাড়িয়ে যায়। নিবন্ধের প্রতিটি অনুচ্ছেদে আমি সংখ্যার আড়ালে লুকিয়ে থাকা মানুষের গল্প খুঁজেছি। কিন্তু কিছু অনুভূতি থাকে, যেগুলো যুক্তি দিয়ে নয়–শুধু কবিতায় বলা যায়। সেই অনুচ্চারিত অনুভূতিগুলোর প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে এই লেখার সমাপ্তি হোক একটি কবিতায়।

টাকা শুধু কাগজ নয়,
নয় ধাতুর নিঃশব্দ কোনো পরিচয়।
তার প্রতিটি ভাঁজে, প্রতিটি রেখায়,
লুকিয়ে থাকে অগণিত জীবনের অধ্যায়।

কোথাও সে কৃষকের কপালের ঘাম,
সবুজ ধানের ক্ষেতে জেগে ওঠা এক নাম।
কোথাও সে মায়ের নীরব প্রার্থনা,
সন্তানের মুখে ফুটে ওঠা নতুন সম্ভাবনা।

কোথাও সে শ্রমিকের ক্লান্ত দুটি হাত,
দিন শেষে ঘরে ফেরার নিশ্চিন্ত এক রাত।
কোথাও সে বৃদ্ধ বাবার ওষুধের আশ্বাস,
কোথাও কন্যার বইয়ে লেখা আগামির বিশ্বাস।

কোথাও সে শিক্ষার্থীর অদম্য স্বপ্নের ডানা,
কোথাও উদ্যোক্তার হার না-মানা পথচলার ঠিকানা।
কোথাও সে অসুস্থ শিশুর চিকিৎসার আলো,
কোথাও একটি পরিবারের দীর্ঘশ্বাসের অবসান গুছানো।

প্রতিটি টাকার একটি গল্প আছে।
আর সেই গল্পের প্রতিটি পাতায় লেখা থাকে
একটি মানুষের জীবন।

লেখক: হিসাব কর্মকর্তা, প্রধান কার্যালয়, সিদীপ

২০২৫ সালে অনুষ্ঠিত 'ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমের গুণগতমান বৃদ্ধির লক্ষ্যে সকল পর্যায়ের কর্মীদের নৈতিক দায়িত্ব ও কর্তব্য' শীর্ষক রচনা প্রতিযোগিতার ফলাফল

নাম	শাখা (তৎকালীন অবস্থান)	স্থান
মো. শহিদুল ইসলাম	এনায়েতপুর, সিরাজগঞ্জ	১ম
মো. আব্দুল সুলতান	চাঁপাইনবাবগঞ্জ	১ম
মো. আব্দুল বারী	সখিপুর, টাঙ্গাইল	২য়
আশিক পান্ডে	শোল্লা, ঢাকা	৩য়
মো. জুবায়দুর রহমান	ইসলামপুর, মুন্সিগঞ্জ	সেরা
শহিদুল ইসলাম	মুন্সিগঞ্জ সদর	সেরা
মাহফুজ সাত্তার বাবুন	দাগনভূঁইয়া, ফেনী	সেরা
মো. মুরাদ হোসেন	এনায়েতপুর, সিরাজগঞ্জ	সেরা
এস.এম. মাসুদ	ভবানীগঞ্জ, লক্ষ্মীপুর	সেরা
মরিয়ম আক্তার	টঙ্গীবাড়ী, মুন্সীগঞ্জ	সেরা
মো. আব্দুস ছালাম	আশুলিয়া, ঢাকা	সেরা
রিফাত আহমেদ	তানোর, চাঁপাইনবাবগঞ্জ	সেরা
ফারুক হোসেন	বাখরাবাদ, কুমিল্লা	সেরা

নাম	শাখা (তৎকালীন অবস্থান)	স্থান
মো. তারিকুল ইসলাম	সলিমগঞ্জ-২, ব্রাহ্মণবাড়িয়া	সেরা
মিঠুন চন্দ্র দে	প্রধান কার্যালয়, ঢাকা	সেরা
রনি ইসলাম	মাধবপুর বাজার, কুমিল্লা	সেরা
মো. আব্দুল আলীম	বড়চওনা বাজার, টাঙ্গাইল	সেরা
মো. সেলিম লোহানী	বনপাড়া, নাটোর	ভালো
মো. শহিদ মিয়া	নগরপাড়, কুমিল্লা	ভালো
মোহাম্মদ মোবারক হোসেন	লাঙ্গলবন্দ, নারায়ণগঞ্জ	ভালো
মো. রবিউল ইসলাম	বাঘা, রাজশাহী	ভালো
মো. শহিদুল ইসলাম	নলডাঙ্গা, নাটোর	ভালো
আনিসুর রহমান	ডেমরা, ঢাকা	ভালো
মোহাম্মদ আলী	প্রধান কার্যালয়, ঢাকা	শুভেচ্ছা
আফরোজা আলী	প্রধান কার্যালয়, ঢাকা	শুভেচ্ছা

মোহমায়া

কাজী মাজহারুল ইসলাম রাসেল

২০০৪ সাল, ভর্তি পরীক্ষার যুদ্ধের জন্য ঢাকা এসে, আমি অদ্ভুত এক অস্থিরতায় আক্রান্ত হলাম। আমার অবস্থা হলো রবীন্দ্রনাথের ছুটি গল্পের ফটিকের মতো কেবল একটা ফিরে যাইবার অন্ধ ইচ্ছা, কেবল একটা না দেখিয়া অব্যক্ত ব্যাকুলতা আমাকে সর্বদা গ্রাস করে রাখতো।

আমি আমার সমস্ত অন্তরাত্মা দিয়ে অনুভব করতে লাগলাম ফেলে আসা সবকিছু, আমার শান্ত সকাল কিংবা স্নিগ্ধ বিকাল, মফস্বলের অলি গলি, রিকশার ক্রিং ক্রিং শব্দ, ক্লান্ত ঘর্মাক্ত দুপুর, ঘামে লেপ্টে থাকা স্কুল ইউনিফর্ম, দুরন্ত ছুটে চলার তারামাঠ, সাইকেলের প্যাডেল দ্রুত চেপে কাঁধে ব্যাগ নিয়ে কোনো কিশোরের প্রাইভেট পড়াতে যাওয়া, সকালে আম্মার আটার রুটি কিংবা ডিম ভাজার গন্ধ, রোজকার দুধওয়ালার দুধের পাতিলের হাঁক, দরজার ফাঁক গলে পড়ে থাকা আজকের পত্রিকা, বিষন্ন বিকেলে তিতাস পাড়ে খেয়া পারাপার, টেক্সট বইয়ের নিচে লুকিয়ে রাখা গল্পের বই, আব্বার হাতে মলাট করা নতুন বইয়ের ঘ্রাণ, নিঃশব্দে নেমে আসা সন্ধ্যায় পোয়া পুকুর পাড় ধরে ত্রস্ত পায়ে বাড়ি ফেরা। অতীত অবগাহন আমার দুর্বল চিত্তের মধ্যে বিথোভেন এর মতো করে ধ্বনিত হতে থাকলো।

কাজীপাড়া, মিরপুরে তিন রুমের একটা বাসায় আমরা চার বন্ধু মিলে উঠলাম। তিন রুমের আইডিয়াটা আমার। দুই রুম এ দুইজন করে থাকব আর একটা হবে রিডিং রুম। আাডিয়াটা ভালো কাজে দিলো। আতিকের বিশ্ববিদ্যালয় পড়ুয়া বড় ভাইয়ের সুবাদে একজন রাঁধুনি পাওয়া গেলো। অন্নই ব্রহ্ম, এই বেদবাক্য মেনে আমরা খেলেও, লাভের মধ্যে যা হলো, খাবার স্যালাইন হলো আমাদের নিত্যসঙ্গী। একদিন তো গৃহস্ত সরাসরি কবাটে আঘাত হানলেন। ব্যাপার তেমন গুরুতর না, বাড়ির চারপাশের ড্রেন স্যালাইনের প্যাকেটে বন্ধ হয়ে গেছে।

ত্রিকোনমিতির মতো কৌণিক প্রিসিশনে, লগারিদম এর মতো এক্সপোনেনশিয়াল ব্যস্ততায় জীবন চলছিল। ওমেকায় যখন বুয়েট কোচিংয়ের জন্য ভর্তি হতে গেলাম, পরিচয় হলো পরিচালক মিজান ভাইয়ের সাথে। আমাকে দেখে সে একটানে বলে গেল, "মাজহার, সিলেট ক্যাডেট কলেজ, টেস্ট এক্সাম মার্ক ৯৪৫, ফোন নাম্বার ০৮৫১৬২৭১১ (আমার তখন মোবাইল ছিলো না, তাই বাসার টিএনটি নাম্বার)। আমি চন্দ্রাহত হয়ে তাকিয়ে রই। আমার একটা গভীর জীবনবোধ তৈরি হয় এই ঘটনা থেকে। ঢাকা শহরের উচ্চবিত্ত, আমার দেখা প্রিভিলেজড হাই সোসাইটির বন্ধুবান্ধবদের সাথে যখন আমার চিরোচেনা সেকেলে মধ্যবিত্ত আইডিওলজি দুই মেরুতে তখন মিজান ভাইয়ের বক্তব্য আমার জন্য রকি মাউন্টেন কিংবা মিসিসিপির শুকনো বনাঞ্চলে একটা স্পার্কের মতো হলো।

যারা এখন স্কুল, কলেজে পড়ছো, তাদেরকে বলি শোন, বাংলাদেশের মতন ইকোনমির একটা দেশে, এখনো এডুকেশনের থেকে সাস্টেইনেবল, দীর্ঘস্থায়ী, ঝুঁকিহীন, প্রেস্টিজ জেনারেটিং কোন ক্যারিয়ার তৈরি হয় নাই! এখনো আমাদের প্রায় সব রকমের মুক্তির জন্য সেরা সিঁড়িগুলো এডুকেশনই বানিয়ে দেয়। তোমার সামাজিক, মানসিক আত্মিক উত্তরণ ঘটায়।

এদিক ওদিক নানাভাবে হয়তো অর্থবিত্ত কামানো যায়, কিন্তু এডুকেশন এখনো একটা পুরো ব্লাড লিনিয়েজকে ধীরে লাইনে নিয়ে আসে, জ্ঞান আরো সূক্ষ্মতায় যায়। আলাপে, বাহাসে আরো নতুন ভাবনার জাগরণ হয়, বই হয়, গল্প হয়, আলো দেয়া জোনাকির মতন নতুন ফিলোসফি তৈরি হয় ঘরে। এই ধারা থেকেই উঠে আসে আল মাহমুদ কিংবা আকবর আলী খানরা।

ওমেকা আর প্রাইমেট কোচিংয়ের দ্বিমুখী টানে ফার্মগেটের ওভারব্রিজে বসা ভিক্ষুকদের কাছে আমি পরিচিত মুখ হয়ে উঠলাম, আমিও সিন্সিয়ারলি তাদের সালামের উত্তর দিতাম।

আমাদের সময়ে একটা ভালো কিছু দেখলে শুনলে আমরা এটাকে নিজের মধ্যে নিয়ে আসার চেষ্টা করতাম। তখন মেট্রিক এবং ইন্টারমিডিয়েট এর রেজাল্ট যেদিন দিত সেটা আমাদের মধ্যে সঞ্জীবনী রসের চেয়েও বেশি কিছু ছিলো। পত্রিকার পাতা কিংবা বিটিভির প্রোগ্রামে স্ট্যান্ড করাদের নিয়ে ফিচার হত, খুব দ্রুত নিজেকে স্ট্যান্ড করাদের কাতারে কল্পনা করে নিতাম, নির্দ্বিধায়, নিঃসঙ্কোচে। ফিজিক্সের ব্ল্যাক হোল যেদিন পড়লাম, সেদিন এরনোটিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ে নাসার সায়েন্টিস্ট হবার স্বপ্ন দেখতে আমাদের একটুও সময় লাগতো না।

কম বয়সে কত মানুষের মুখে কেবল একটা বইয়ের নাম শুনে তারে কত কাছের মনে হতো! কারো কাছ থেকে কিছুটা অন্যরকম কোন অবজারভেশন শুনতে পেলে, একটা অপরিচিত মুভি, লেখক, নজরুলের কবিতার দুইটা লাইন কিংবা সুনীল বা শক্তির দুইটা পঙ্‌ক্তি যে একটু আবেগ নিয়ে

বলতে পারত কিংবা যে প্রথম আমাকে সুনীল, সমরেশ, শীর্ষেন্দু, মোপাসা, কাফকা এর সাথে আমার পরিচয় করে দিল, সবসময় মনে হত, এই মস্তিষ্কের কাছাকাছি হতে হবে! এটাই আমার মনস্তাত্ত্বিক মুক্তি। আমি ভালো করেই জানতাম মনন মগজের এই অংশকে শানিত করতে না পারলে এলিটিজম এর অহংকারকে আমি পদাবনত করতে পারব না।

ম্যাট্রিক বা ইন্টারমিডিয়েটের রেজাল্টের প্রসঙ্গে ফিরে যাই। সালটা আমার ঠিক মনে নেই, বিটিভিতে মেধাবী মুখ অনুষ্ঠানে, বোর্ড স্ট্যান্ড করা স্টুডেন্টদের মাঝে একজন আপুকে গান গাইতে দেখলাম "কেহ জানিবে না মোর গভীর প্রণয়/কেহ দেখিবে না মোর অশ্রুবারিচয়" আমি তখন বুঝতে পারি স্যাপিওসেক্সুয়াল বলে একটা ব্যাপার আছে। বলার অপেক্ষা রাখে না কিশোর মনের ইনফ্যাচুয়েশন তখন মুগ্ধতায় সারাবেলা আচ্ছন্ন হয়ে থাকল। বেশ কিছুদিন পর বাসায় বসে বিটিভিতে নাটক দেখছি "অমি যখন বন্দি"। অবাক হয়ে লক্ষ্য করলাম নাটকের নাম ভূমিকায় থাকলেন স্ট্যান্ড করা গান গাওয়া সেই আপুটি। পরদিন বন্ধু মহলে আমি কেন্দ্রিক অনেক আলোচনা হয়, শার্লক হোমস এর একটা দল বের করে ফেলে আপুটি ঢাকায় একটি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়েন। কোচিং এ যখন বুয়েট/মেডিক্যাল এর ভাব চলে আসলো সেই পুরনো ইনফ্যাচুয়েশন মাথা চাড়া দিয়ে উঠল। আমি আর শাহরিয়ার পরিকল্পনা করে একদিন বিশ্ববিদ্যালয়টিতে এর একটি বিশেষ ডিপার্টমেন্ট এর সামনে দাঁড়িয়ে থাকি। কিন্তু এটা কি সম্ভব অচেনা অজানা এক জায়গায় হাজার মানুষের ভিড়ে কাউকে খুঁজে পাওয়া?

এর মাঝে শাহরিয়ার জানতে পারে নাগরিক সম্প্রদায়-এর নাটক রক্তকরবীর শো হয় বেইলি রোড, মহিলা সমিতির মঞ্চে। সেখানে মাথায় রক্তকরবী আর পায়ে আলতা দিয়ে নন্দিনী চরিত্রটি তিনিই করেন।

তারপর এক শুক্রবার আমি আর শাহরিয়ার পকেটে ২৫০ টাকা করে গুঁজে ভলভো ডাবল ডেকার করে বেইলি রোডে গিয়ে হাজির হলাম। চারপাশে ঝোলা ব্যাগ আর রাশভারী লোকজন দেখে আমরা নিজেদের সঙ্কোচে লুকাতে না পেরে ফিরে যাব কিনা ভাবছি কিন্তু ইশ্‌ক জুনুন যাব হদ্‌সে বাড় যায়ে/ হাঁস্তে হাঁস্তে আশিক শূলি চাড় যায়ে (ভালোবাসার উন্মাদনা যখন সীমা ছাড়িয়ে যায়, তখন প্রেমিক হাসতে হাসতেই ফাঁসির মঞ্চে উঠে যায়)। পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতির সংকোচ তো কিছুই না যেখানে আশিক ফাঁসিতে ঝুলতেও দ্বিধা করে না। নাটকটি ৪টি অঙ্কে উপস্থাপন হলো। রাজা চরিত্রে ছিলেন গোলাম মোস্তফা, কিশোর যে কে ছিলো মনে নাই, মনে রাখার প্রয়োজনও বোধ করলাম না। পায়ে ঘুঙুর, মাথায় গুঁজা রক্তকরবী আর পরনে গুজরাতি কায়দায় পড়া শাড়িতে নন্দিনী ধরা দিল প্রেম, সৌন্দর্য আর মুক্তির সহায় হয়ে। যখন নাটক শেষে বের হচ্ছি মনে মনে বিউটি উইথ ব্রেইন আর বিউটি এন্ড দ্য বিস্ট চিন্তা করছিলাম।

এরপর অনেক চন্দ্রভূক অনেক অমাবস্যা পেরিয়ে ২০০৪ সালের মার্চ মাসে এরনোটিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার হওয়ার মোহমায়ায় আমি বুয়েট এর যন্ত্রকৌশল বিভাগে ভর্তি হবার ৭ দিন পর ভর্তি বাতিল করে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি হলাম। শাহরিয়ার তড়িৎকৌশল বিভাগেই রয়ে গেল। এর পর ওই ডিপার্টমেন্টের সামনে দিয়ে অনেক আসা যাওয়া হয়েছে, কিন্তু মোহমেঘ সরে গেছে।

লেখক: সহকারী অধ্যাপক, (MBBS, BCS, MRCS, MCPS, FCPS, FCPS), সার্জারি, ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ

তিতাস নদীর বাঁকে

হুমায়ূন কবির

বর্ষাকালে তিতাস নদী
জলে থাকে উচ্ছলা
চাঁদের ছায়া জলে পড়ে
হয় যে আরো উজ্জ্বলা।

নদীর পাশে বাড়ি আমার
মানুষ নদীর বাঁকেতে,
রোজ সকালে ঘুম যে ভাঙ্গে
শতো পাখির ডাকেতে।

শরৎ এলে নদীর তীরে
কাশফুল ফোটে বনেতে,
শরৎ বায়ু লাগলে গায়ে
সুখ যে আসে মনেতে।

বুনোফুলে ভরা থাকে
নদীর ঘেঁষা তীরেতে,
শীতের ভোরে শিশির দূর্বায়
হাটি আমি ধীরেতে।

ফুলে পাখি ভরা নদী
আমার জীবন তরীতে,
মুক্তা মানিক রতন যেনো
ভরা আমার থলিতে।

মুক্তপাঠাগার বইমেলা

মাহফুজুল মিথুন

“পৃথিবীটা নাকি ছোটো হতে হতে
স্যাটালাইট আর কেবলের হাতে
ড্রইংরুমে রাখা বোকা-বাক্সতে বন্দী
ঘরে বসে সারা দুনিয়ার সাথে
যোগাযোগ আজ হাতের মুঠোতে
ঘুচে গেছে দেশ-কাল-সীমানার গণ্ডি”

লাইনগুলো যেন গ্লোবালাইজেশনকেই বোঝাচ্ছে, তাই না? মানুষ আজ তার হাতের স্মার্টফোনের মাধ্যমে তাৎক্ষণিক গোটা দুনিয়ার সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করতে পারে। মানুষের যত জিজ্ঞাসা, ইন্টারনেট অল্প সময়েই তার উত্তর খুঁজে বের করে দিতে পারে। তবে এর ক্ষতিকর দিকও আছে। গানের মতো “ড্রইংরুমে রাখা বোকা-বাক্সতে বন্দি হয়ে গেছি আমরা”। শুধু বোকা-বাক্সটা, যা একসময় ছিল টেলিভিশন, তার আকার ছোট হয়ে আজ হাতের স্মার্টফোন হয়ে গিয়েছে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা মানুষ আজ সোশ্যাল মিডিয়ায় অহেতুক স্ক্রলিং করেই কাটাচ্ছে “নেশাতুর চোখ টিভি পর্দায়” থেকে এখন মোবাইল ফোনের স্ক্রিনে।

বর্তমানে রিলসের মতো স্বল্পদৈর্ঘ্যের ভিডিও আমাদের বিনোদনের একটি জনপ্রিয় মাধ্যম হয়ে উঠেছে। কিন্তু গবেষণায় দেখা যাচ্ছে, অতিরিক্ত স্বল্পদৈর্ঘ্যের ভিডিও ব্যবহারের সঙ্গে মানুষের দীর্ঘসময় মনোযোগ ধরে রাখার ক্ষমতা এবং নিজের আচরণ ও মনোযোগ নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা কমে যাওয়ার সম্পর্ক রয়েছে। স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ের শিক্ষার্থীর ওপর পরিচালিত এক গবেষণায় দেখা গেছে যে প্রবলেম্যাটিক স্বল্পদৈর্ঘ্যের ভিডিও দেখার সঙ্গে অ্যাকাডেমিক ইনঅ্যাটেনশনের একটি উল্লেখযোগ্য ইতিবাচক সম্পর্ক রয়েছে। গবেষণাটিতে অ্যাকাডেমিক ইনঅ্যাটেনশন বলতে মনোযোগ কমে যাওয়া, সহজে মনোযোগ বিচ্ছিন্ন হওয়া এবং মানসিক ক্লান্তিকে বোঝানো হয়েছে [১] [২]। অর্থাৎ, প্রযুক্তি যেমন আমাদের জ্ঞান ও যোগাযোগের জগৎকে হাতের মুঠোয় এনে দিয়েছে, তেমনি এর অতিরিক্ত ও অনিয়ন্ত্রিত ব্যবহার আমাদের মনোযোগ ও গভীরভাবে কোনো কিছুতে মগ্ন থাকার সক্ষমতার জন্য নতুন চ্যালেঞ্জ তৈরি করছে। দ্রুতগতির ডিজিটাল কনটেন্টের এই সময়ে তাই শিশু-কিশোরদের দীর্ঘসময় মনোযোগ ধরে রাখা, ধৈর্যশীলভাবে পড়া এবং বইয়ের সঙ্গে গভীর সম্পর্ক গড়ে তোলার সুযোগ তৈরি করা ক্রমেই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে। আর এই প্রয়োজন থেকেই তাদের বই পড়ার আগ্রহ বাড়াতে বিকল্প ও সহজ পাঠের পরিবেশ তৈরির উদ্যোগ হিসেবে গড়ে উঠেছে ‘ মোহাম্মদ ইয়াহিয়া মুক্তপাঠাগার’।

সিদীপের তত্ত্বাবধানে এই মুক্তপাঠাগার বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে একটু ব্যতিক্রম। নাম মুক্তপাঠাগার, মূলত একটি বুক শেলফ, যা স্থাপন করা হয় স্কুলের বারান্দার একটি কোণায়। এটি সবসময় উন্মুক্ত রাখার চেষ্টা করা হয়। তালাবদ্ধ করে রাখা হয় না, যাতে শিক্ষার্থীরা খুব সহজেই বই নিয়ে পড়তে পারে। পাঠাগারের বইগুলো মূলত স্থানীয় শিক্ষানুরাগী মানুষদের কাছ থেকে সংগ্রহ করা হয়। এছাড়াও শিক্ষার্থীদের বই পড়ার প্রতি আগ্রহী করে তুলতে মুক্ত পাঠাগারের পক্ষ থেকে বিভিন্ন আয়োজন করা হয়। যেমন; সেরা পাঠক-পাঠিকাদের পুরস্কার প্রদান, বই পর্যালোচনার ওপর পুরস্কার এবং সবচেয়ে ইন্টারেস্টিং গ্রামীণ এলাকার স্কুলগুলোতে বইমেলার আয়োজন। সম্প্রতি আমার সুযোগ হয়েছিল এমন একটি আয়োজন দেখার। বই মেলাটি হয়েছিল পাবনার দেবোত্তর পাইলট বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ে। আয়োজন বলতে খুব সাধারণ, এতোটাই সাধারণ যে একে আপনি সাধারণের আদর্শ উদাহরণ বলতে পারেন। স্কুলের বারান্দায় তিনটি লম্বা টেবিলে নতুন সব বই সাজিয়ে বসে থাকা। সত্যি বলতে, আমার এক্সপেকটেশন ছিল না যে শিক্ষার্থীরা এত আগ্রহ নিয়ে এসে বই দেখবে বা বই কিনবে। স্কুলের প্রধান শিক্ষক কয়েকদিন আগে থেকেই বই মেলার বিষয়টি শিক্ষার্থীদের জানিয়ে রেখেছিলেন। শিক্ষার্থীরা আগ্রহের সাথেই অপেক্ষা করছিল বই মেলাটির জন্য। এদের মধ্যে অনেকেরই এটি প্রথম বই মেলা দেখার বা অংশগ্রহণ করার অভিজ্ঞতা ছিল। দলবেঁধে শিক্ষার্থীরা আসছিল, তাদের পছন্দের বই নেড়েচেড়ে দেখছিল। একজন একটি বই দেখার পর রেখে দিলে অন্যজন আবার সেই বইটা খুলে

---

১ নগুয়েন এট আল. (২০২৫) । ফিডস, ফিলিংস, অ্যান্ড ফোকাস: এ সিস্টেমেটিক রিভিউ অ্যান্ড মেটা-অ্যানালাইসিস এক্সামিনিং দ্য কগনিটিভ অ্যান্ড মেন্টাল হেলথ কোরিলেটস অব শর্ট-ফর্ম ভিডিও ইউজ।

২ রেশমা বি. এট আল. (২০২৬)। কগনিটিভ ডিস্ট্র্যাকশন ইন দ্য ডিজিটাল এজ: ইফেক্টস অব শর্ট-ফর্ম ভিডিও অন স্টুডেন্টস’ একাডেমিক অ্যাটেনশন। এডুকেশনাল অ্যান্ড ডেভেলপমেন্টাল সাইকোলজিস্ট।

দেখছিল। কেউবা তার পছন্দের বইটি অন্য সহপাঠীকে দেখাচ্ছিল। জমজমাট বই মেলা বলতে যা বুঝি আমরা, এই বই মেলাটিকে সেভাবেই সংজ্ঞায়িত করা যায়। শুধু যে বই নেড়েচেড়েই দেখেছে, তা না। ওদের মধ্যে বই কেনারও যথেষ্ট সাড়া ছিল। লক্ষ্য করলাম, শিক্ষার্থীদের মধ্যে ছোটগল্প, উপন্যাস আর হরর গল্পের বই কেনার আগ্রহ সবচেয়ে বেশি ছিল। এদের মধ্যে অনেকেই গত কয়েকদিনের টিফিনের টাকা বাঁচিয়ে বই কিনেছে। কেউ বাবা-মায়ের কাছ থেকে বই কেনার কথা বলে টাকা সংগ্রহ করে রেখেছিল, আবার অনেকেই কাছের আত্মীয়স্বজনের কাছ থেকে টাকা নিয়েছে বই কেনার জন্য। এর মাঝে ইন্টারেস্টিং একটি ব্যাপার ছিল, কয়েকজন বান্ধবী মিলে কন্ট্রিবিউট করে বই কিনেছে, যা পরবর্তীতে একজনের পড়া হলে অন্যজন পড়বে বলে তারা ঠিক করেছে। সবাই যে শুধু নিজের জন্যই বই কিনেছে, এমন না। একজনকে দেখেছি, তার ছোট ভাইয়ের জন্য বই কিনেছে। ঢাকার কোলাহল পেরিয়ে গ্রামীণ একটি স্কুলে এমন সব দৃশ্য নিঃসন্দেহে আমার প্রাণশক্তি বাড়িয়ে দিয়েছে। সেইসঙ্গে আমাকে আশাবাদী করেছে যে, এই যান্ত্রিক সময়ে আমাদের তরুণরা আবার হয়তো বইয়ের দিকে ফিরবে। পরিশেষে, নিজের কথাও একটু বলা প্রয়োজন। আমি সদ্য শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে গ্র্যাজুয়েশন শেষ করে সিদীপের রিসার্চ অ্যান্ড পাবলিকেশন ডিপার্টমেন্টে অ্যাসিস্ট্যান্ট অফিসার হিসেবে যোগদান করেছি। কর্মজীবনের জন্য সিলেটের চেনা-পরিচিত জীবন ছেড়ে কোলাহলপূর্ণ ঢাকায় আসতে হয়েছে। কিন্তু ঢাকার এই ব্যস্ত জীবনের মাঝেও মুক্তপাঠাগারের মতো একটি অর্থবহ উদ্যোগের সঙ্গে কাজ করার সুযোগ আমাকে নতুন এক ধরনের আনন্দ দিয়েছে। গবেষণার কাজ করতে গিয়ে আমরা অনেক সময় সংখ্যা, তথ্য আর ফলাফলের মধ্যে মানুষের গল্পগুলোকে খুঁজে বেড়াই। কিন্তু একটি গ্রামীণ স্কুলের বারান্দায় দাঁড়িয়ে যখন দেখলাম, কয়েকজন শিক্ষার্থী নিজেদের টিফিনের টাকা জমিয়ে বই কিনছে, বন্ধুরা মিলে একটি বই কিনে ভাগাভাগি করে পড়ার পরিকল্পনা করছে, তখন মনে হলো, বই পড়ার আগ্রহ হয়তো এখনো হারিয়ে যায়নি। শুধু দরকার বইকে ওদের কাছে আরও সহজলভ্য করে তোলা, তাদের হাতে তুলে দেওয়ার মতো একটি সুযোগ তৈরি করা। মুক্তপাঠাগার হয়তো সেই ছোট্ট সুযোগটিই তৈরি করছে। আর এই ছোট্ট উদ্যোগগুলোই একদিন আমাদের পাঠাভ্যাস ও লাইব্রেরি সংস্কৃতিতে বড় পরিবর্তনের সূচনা করবে, এই বিশ্বাস নিয়েই আমি মুক্তপাঠাগারের সঙ্গে আমার এই পথচলাকে উপভোগ করতে চাই।

লেখক: গবেষণা ও প্রকাশনা কর্মকর্তা, সিদীপ

শিক্ষালোক নিয়ে পাঠকের ভাবনা

শ্রদ্ধেয় সম্পাদক,

আপনাদের গুরুত্বপূর্ণ প্রকাশনা শিক্ষালোক মে-জুলাই ২০২৬ সংখ্যাটি গতকাল পেলাম। অনেক ধন্যবাদ। এবারের সংখ্যার বিষয় (Theme) "উন্নত শিক্ষাব্যবস্থা ও রাষ্ট্রব্যবস্থার জন্য করণীয়"। এ বিষয়ে বক্তৃতা দিয়েছিলেন সম্প্রতি প্রয়াত অধ্যাপক আবুল কাসেম ফজলুল হক। লেখাটার মূল প্রতিপাদ্য বিষয় মনে করি, উন্নত শিক্ষাব্যবস্থায় রাষ্ট্রের দায়িত্ব বা করণীয়। একটা তাৎপর্যপূর্ণ বিষয়।

অধ্যাপক ফজলুল হক, তাঁর চিন্তা-চেতনায় অগ্রসরমনস্ক হিসেবেই পরিচিত তাঁর পেশাগত অধ্যাপনা জীবনে এবং প্রকাশ্যেও তার বুদ্ধিবৃত্তিক লেখাযোখায়। রাজনীতি ও অনেক সময় নীতিমালা বহির্ভূত রাজনীতিতে নানাভাবে বিস্তৃত হয় এবং পরবর্তীতে "রাষ্ট্রব্যবস্থার মডেল নির্বাচন করে"।

এ বাস্তবতার আলোকে আমাদের নিজেদের প্রয়োজনে, সামর্থ তথা অতীত অর্জন ও ভবিষ্যত লক্ষ্যের নিরিখে ভবিষ্যতের কর্মধারা নির্ধারণ ও বাস্তবায়ন করা উচিত। কিন্তু জাতীয় নেতাদের সক্ষমতার অভাবে তা সম্ভব হয়নি। এবং এ দিগভ্রষ্ট ধারা এখনো বিদ্যমান।

"থিমেটিক" অর্থাৎ লক্ষ্যাভিমুখী দৃষ্টিভঙ্গির বাইরেও আমার ভালো লাগে আপনাদের প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রমের পরিচিতি লাভ করা। প্রতি সংখ্যায় আপনারা এটা করে থাকেন। এরফলে পাঠকের সাথে সংগঠনের যোগাযোগ তৈরি হয় ও তা অক্ষুণ্ন রাখতে পারে। সব শেষে কিন্তু আমার দৃষ্টিতে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো নিজেরাই পাঠাগার স্থাপন করেন অথবা অন্য কোনো সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানের খবর পাঠককে জানান। আসলেই বই পড়া বা বিদ্যাচর্চার প্রয়োজন আজীবনই থেকে যায়।

এতো দীর্ঘ লেখা লিখে ফেলবো তা শুরুতে ভাবিনি। ধৈর্যচ্যুতি ঘটানো হলে ক্ষমা করবেন। আপনাদের সর্বাঙ্গীন মঙ্গল কামনায়।

তারিক আহমদ
উন্নয়নকর্মী

স্ক্যাবিস

ডা. এ. কে. এম. আব্দুল কাইউম

স্ক্যাবিস (Scabes) অত্যান্ত সংক্রামক (ছোয়াঁছে) এক ধরনের তীব্র চুলকানিযুক্ত চর্মরোগ, যা নারীপুরুষ, ছোট-বড় সকলেরই হয়ে থাকে। রোগটিকে বাংলায় খুঁজলি/খোঁস-প্যাঁচড়া নামেও আখ্যায়িত করা হয়। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার (WHO) মতে প্রতি বছর বাংলাদেশে ৫০ লাখ লোক স্ক্যাবিসে আক্রান্ত হয়। রাজধানী ঢাকা শহরের ৩২-৩৪% লোক এ রোগের শিকার। অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ, স্বাস্থ্যসম্মত খাবার গ্রহণ না করা এবং দেহের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যাওয়ার কারণেই এ সমস্যাটি বর্তমানে প্রকট আকার ধারণ করেছে বলা যেতে পারে।

রোগ সৃষ্টিকারী জীবানু: সারকোপ্টিস স্ক্যাবিস (Sarcoptes Scabes) নামক এক ধরনের ক্ষুদ্র পরজীবী (Parasite) যা মানুষ কিংবা প্রাণীদেহের চামড়ার নিচে গর্ত ও সুড়ঙ্গ তৈরির মাধ্যমে নিজের বাসস্থান ও বংশ বিস্তার নিশ্চিত করে থাকে। ক্ষুদ্র পরজীবী (Parasite) বিধায় এদেরকে মাইট(Mite) বলা হয়। মাইটগুলো রাতে ত্বকের নিচে সৃষ্ট সুড়ঙ্গ পথের মাধ্যমে বিচরণ করে থাকে এবং ডিম পাড়ে। তাই স্ক্যাবিস রোগে আক্রান্ত হলে রাতের বেলা বেশি চুলকানি হয় এবং আক্রান্ত ব্যক্তির ত্বকে আঁচড়ের দাগ পরিলক্ষিত হয়।

রোগের লক্ষ্মণ ও উপসর্গ: ত্বকে ব্রণ কিংবা ঘামাচির মত লাল বর্ণের বিভিন্ন আকৃতির র‍্যাস দৃশ্যমান হয়। র‍্যাসগুলো প্রচণ্ড চুলকায় এবং রাতের বেলা চুলকানি তীব্র হয়। চুলকানোর ফলে র‍্যাশগুলো ফেটে যায় এবং রক্ত মিশ্রিত পানি বের হয়। র‍্যাসগুলো ব্যাক্টেরিয়া দ্বারা সংক্রমিত হলে পুঁজযুক্ত গোটার সৃষ্টি হয়। হাতের আঙ্গুলের সংস্পর্শে দেহের বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে পড়ে। র‍্যাশগুলো সাধারণত দুই আঙ্গুলের মাঝখানে (চিপায়), হাতের কব্জি, বগলে, স্তনের (Breast) চারপাশে, বুকে, পেটে, নাভির চতুর্পাশে, কোমরে, তলপেটে, উরুতে, পাছায়, পুরুষাঙ্গে,পায়ের গোঁড়ালি ও তলা অবদি ছড়িয়ে পড়ে। শিশু ও বয়স্কদের ক্ষেত্রে চুলকানি বেশি পরিলক্ষিত হয়।

যেভাবে রোগ বিস্তৃত হয়: সংক্রমিত ব্যক্তির সংস্পর্শে গেলে, সংক্রমিত ব্যক্তির পোশাক-আশাক, কাপড়-চোপড় পরিধানের মাধ্যমে, সংক্রমিত ব্যক্তির বিছানায় শোয়ার ফলে রোগটি ছড়ায়। সংক্রমনের লক্ষ্মণ প্রকাশ পেতে এক থেকে দেড়মাস সময় লেগে যেতে পারে।

যারা বেশি ঝুঁকিতে রয়েছেন: ঘনবসতি এবং অপরিচ্ছন্ন পরিবেশে বসবাসকারী লোকজন (বিশেষ করে রোহিঙ্গা শিবির, বস্তিবাসী ও এতিমখানার লোকজন)। ব্যক্তিগত অপরিচ্ছন্নতা এবং অসচেতনতা রোগের অন্যতম কারণ। প্রাপ্ত বয়স্ক নারী-পুরুষ (যারা যৌন সক্রিয়), কোলের শিশু-বাচ্চা (যারা বুকের দুধ পান করে), বাচ্চার মা (যারা শিশুকে বুকের দুধ পান করান), রোগীর পরিচর্যাকারী স্বাস্থ্যকর্মী কিংবা কেয়ার-টেকারদের আক্রান্তের হার বেশি।

রোগ প্রতিরোধ (Prevention): স্ক্যাবিস আক্রান্ত রোগীর সাথে সরাসরি যোগাযোগ এড়িয়ে চলতে হবে। এন্টিসেপটিক সাবান ও শেম্পু দিয়ে নিয়মিত গোসল করতে হবে। বাসি ও নোংরা পোশাক পরিধান করা যাবে না। প্রতিদিন গরম পানিতে ডিটারজেন্ট দিয়ে কাপড় চোপড় ধৌত করতে হবে। আক্রান্ত ব্যক্তির বিছানা শেয়ার করা যাবে না; এমনকি আক্রান্ত ব্যক্তির পোশাক, বিছানার চাদর, গদি-সোফা, ইত্যাদি ব্যবহার করা থেকে বিরত থাকতে হবে এবং এলার্জিমুক্ত স্বাস্থ্যসম্মত খাবার খেতে হবে।

চিকিৎসা পদ্ধতি (Treatment): পারমিথ্রিন (Permethrin) সমৃদ্ধ লোশন, মলম, ক্রিম, সাবান ইত্যাদি পরজীবীনাশক ঔষধপত্র, ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী ব্যবহার করতে হবে। এন্টি-হিস্টামিন (Antihistamin) জাতীয় ঔষধ চুলকানি নিরাময়ের জন্য খেতে হবে। এন্টিবায়োটিক (Antibiotic), যা ব্যাক্টেরিয়া সৃষ্ট সংক্রমণ প্রতিরোধের জন্য নির্ধারিত ডোজ অনুযায়ী ডাক্তারের নির্দেশনা মোতাবেক সেবন করতে হবে। পরিবারের সবাইকে একই সময়ে একইভাবে চিকিৎসা করাতে হবে।

লেখক: চিকিৎসক (এমবিবিএস, এমপিএইচ)

মোহাম্মদ ইয়াহিয়া মুক্তপাঠাগারে চিত্রাঙ্কন কর্মশালা প্রতিযোগিতা এবং সেরা পাঠক-পাঠিকা ও বই পর্যালোচনা প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণ

১০ আগস্ট, ২০২৬ এ সিদীপের চাঁপাইনবাবগঞ্জ শাখার আওতায় হরিপুর বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ে পরিচালিত মোহাম্মদ ইয়াহিয়া মুক্তপাঠাগারের উদ্যোগে পাঠকদের নিয়ে আয়োজিত হয় চিত্রাঙ্কন কর্মশালা ও প্রতিযোগিতা। কর্মশালা উদ্বোধন করেন বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মো. নাসিম আখতার। কর্মশালা পরিচালনা করেন চিত্রশিল্পী শিশির মল্লিক। কর্মশালা শেষে ৫০ জন শিক্ষার্থী চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে। তাদের মধ্য থেকে সেরা ৫ জন প্রতিযোগীকে পুরস্কৃত করা হয়।

এছাড়াও বই পড়ায় উৎসাহিত করতে মুক্তপাঠাগারের সেরা তিনজন পাঠিকাকে পুরস্কার প্রদান করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে বিদ্যালয়ের শরীরচর্চা শিক্ষক মোসা. রীনা খাতুন, সহকারী শিক্ষিক মোসা. শাহনাজ বিলকিস, সিদীপের শিক্ষা সুপারভাইজার তাহসিনা খাতুন, ব্রাঞ্চ ম্যানেজার মো. জাকির হোসেন উপস্থিত ছিলেন। এছাড়াও সিদীপের গবেষণা ও প্রকাশনা কর্মকর্তা মাহবুব উল আলম মুক্তপাঠাগার কার্যক্রম ও বই পড়ার গুরুত্ব বিষয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করেন।

১১ আগস্ট, ২০২৬ এ সিদীপের ভোলাহাট শাখার আওতায় নেকজান বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ে পরিচালিত মোহাম্মদ ইয়াহিয়া মুক্তপাঠাগারের উদ্যোগে পাঠকদের নিয়ে আয়োজিত হয় চিত্রাঙ্কন কর্মশালা ও প্রতিযোগিতা। কর্মশালা উদ্বোধন করেন বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মোসা. হোসনে আরা। কর্মশালা পরিচালনা করেন চিত্রশিল্পী শিশির মল্লিক। কর্মশালা শেষে শিক্ষার্থীরা চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে। তাদের মধ্য থেকে সেরা ৫ জন প্রতিযোগীকে পুরস্কৃত করা হয়। এছাড়াও বই পড়ায় উৎসাহিত করতে মুক্তপাঠাগারের সেরা তিনজন পাঠিকাকেও পুরস্কার প্রদান করা হয় এবং বই পর্যালোচনা প্রতিযোগিতারও পুরস্কার বিতরণ করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক মো. হেদায়েত উল্লাহ, সিদীপের শিক্ষা সুপারভাইজার সোনিয়া আক্তার, ব্রাঞ্চ ম্যানেজার মো. মোশাররফ হোসেন এরিয়া ম্যানেজার মো. আব্দুল সুলতান উপস্থিত ছিলেন। এছাড়াও সিদীপের গবেষণা ও প্রকাশনা কর্মকর্তা মাহবুব উল আলম মুক্তপাঠাগার কার্যক্রম ও বই পড়ার গুরুত্ব বিষয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করেন।

২০ আগস্ট ২০২৬, সিদীপের রায়পুর গৌরীপুর শাখায় পরিচালিত মোহাম্মদ ইয়াহিয়া মুক্ত পাঠাগারের উদ্যোগে ইলিয়টগঞ্জ রাজেন্দ্র বিশ্বনাথ উচ্চ বিদ্যালয়ে সেরা পাঠক পাঠিকা পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয় উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সিদীপের প্রধান কার্যালয় থেকে গবেষণা ও প্রকাশনা কর্মকর্তা মাহফুজুল মিথুন এবং ব্রাঞ্চ ম্যানেজার মো. মনজুরুল হক আরো উপস্থিত ছিলেন উক্ত বিদ্যালয়ের শিক্ষকবৃন্দ ও শিক্ষা সুপারভাইজার শিউলি আক্তার।

মোহাম্মদ ইয়াহিয়া মুক্তপাঠাগার উদ্বোধন

৪ আগস্ট ২০২৬, সিদীপের চট্টগ্রাম জেলার কর্নেলহাট শাখার আওতায় বঙ্গবন্ধু বিদ্যাপীঠে মোহাম্মদ ইয়াহিয়া মুক্তপাঠাগার উদ্বোধন করা হয়। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক প্রিয়াঙ্কা চৌধুরী পাঠাগারটি উদ্বোধন করেন। এসময় বিদ্যালয়ের অন্যান্য সহকারী শিক্ষকবৃন্দ ও অভিভাবকগণ উপস্থিত ছিলেন। শিক্ষক ও অভিভাবকগণ পাঠাগার স্থাপনের এ উদ্যোগকে সাধুবাদ জানান। এছাড়াও সিদীপের কর্নেলহাট শাখার শিক্ষা সুপারভাইজার নাজনীন, ব্রাঞ্চ ম্যানেজার আনোয়ার হোসেন এবং প্রধান কার্যালয় থেকে গবেষণা ও প্রকাশনা কর্মকর্তা মাহফুজুল মিথুন ও মাহবুব উল আলম উপস্থিত ছিলেন।

২৩ আগস্ট ২৬ গাজীপুর এরিয়ার বোর্ডবাজার ব্রাঞ্চের আওতায় স্থানীয় হাজী আহাম্মদ আলী পাবলিক স্কুলে মোহাম্মদ ইয়াহিয়া মুক্তপাঠাগার উদ্বোধন করা হয়। মুক্তপাঠাগার উদ্বোধন করেন বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক জনাব মো. নূরুল আমিন এবং বই পড়ার প্রয়োজনীয়তা নিয়ে বক্তব্য রাখেন। এছাড়া উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিদ্যালয়ের অন্যান্য শিক্ষক, শিক্ষিকা ও শিক্ষার্থীবৃন্দ। সিদীপের বোর্ডবাজার শাখার ব্রাঞ্চ ম্যানেজার জনাব আবুবকর সিদ্দিক, শিক্ষা সুপারভাইজার মোসা. রুনা আক্তার ও প্রধান কার্যালয় থেকে গবেষণায় ও প্রকাশনা কর্মকর্তা গাজী জাহিদ আহ্সান ও মেহতাজ বিনতে আলম উপস্থিত ছিলেন।

মুক্তপাঠাগারে দিনব্যাপী বইমেলা ও উপস্থিত বক্তৃতা প্রতিযোগিতা

১৭ আপস্ট ২০২৬, সিদীপের দেবোত্তর শাখার আওতায় পরিচালিত মোহাম্মদ ইয়াহিয়া মুক্তপাঠাগারের উদ্যোগে দেবোত্তর পাইলট বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ে বই মেলা ও উপস্থিত বক্তৃতা প্রতিযোগিতা আয়োজন করা হয়। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মাহবুবা খাতুনের সভাপতিত্বে বইমেলা উদ্বোধন করেন সরকারি শহিদ বুলবুল কলেজের ভাইস প্রিন্সিপাল বিশিষ্ট কথা সাহিত্যিক আখতার জামান। প্রতিযোগিতাশেষে প্রতিযোগীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করা হয়। এছাড়াও মুক্তপাঠাগারের সেরা পাঠক-পাঠিকা ও বই পর্যালোচনা প্রতিযোগিতার পুরস্কার প্রদান করা হয়। এ সময় মুক্তপাঠাগারের দুইজন পাঠক (মনিকা জাহিন মোহনা ও তাথিয়া নওশিন মাইশা) যারা এসএসসি-২০২৫ পরীক্ষায় উপজেলায় মেধা তালিকায় যথাক্রমে ১ম ও ৪র্থ হয়েছে তাদেরকে এবং সর্বোচ্চ বই পড়ার জন্য ৮ম শ্রেণির শিক্ষার্থী ইয়ামনিকে সিদীপরে পক্ষ থেকে বই উপহার দেয়া হয়েছে। অনুষ্ঠানটি সমন্বয় করেন সাংস্কৃতিক সংগঠক ও লেখক রেজাউল করিম শেখ ও সিদীপের শিক্ষা

সুপারভাইজার কাকলি খাতুন। এছাড়াও অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন দেবোত্তর পাইলট বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের সিনিয়র শিক্ষক মোনায়েম খান ও সহকারী শিক্ষক মো. আনোয়ার হোসেন এবং সিদীপের ব্রাঞ্চ ম্যানেজার মো. সিরাজুল ইসলাম, গবেষা ও প্রকাশনা কর্মকর্তা মাহফুজুল মিথুন ও মাহবুব উল আলম।

বই পর্যালোচনা

অধ্যাপক আবুল কাসেম ফজলুল হকের "কালের যাত্রার ধ্বনি" রাজনীতি ও সাংস্কৃতিক রূপান্তরের কথা

শিশির মল্লিক

'কালের যাত্রার ধ্বনি' রবীন্দ্রনাথের শেষের কবিতার একটি বিখ্যাত কবিতার প্রথম পঙ্‌ক্তির অংশবিশেষ। এই চরণটির মধ্যদিয়ে লেখক আবুল কাসেম ফজলুল হক বাঙ্গালীর একটি ঐতিহাসিক সময়কালকে মূল্যায়ন করবার চেষ্টা করেছেন। লেখক অধ্যাপক আবুল কাসেম ফজলুল হক "কালের যাত্রার ধ্বনি"তে জাতির মানস গঠনে রাজনীতি ও সংস্কৃতির ইতিবাচক অভীষ্টকে সামনে রেখে সময়ের প্রেক্ষিতকে পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ করেছেন। বইটির প্রথম প্রকাশ ১৯৭৩ সাল। বিভিন্ন পর্যায়ে বইটি মোট পাঁচবার প্রকাশিত হয়েছে, সর্বশেষ প্রকাশনা ২০২০ সালে। বিভিন্ন সময় এটি পরিমার্জন করা হয়েছে। কিছু প্রবন্ধ নতুন সংযোজিতও হয়েছে যা ভূমিকায় লেখক জানিয়েছেন। মোট আটটি প্রবন্ধ এতে সংকলিত হয়েছে। প্রত্যেকটি প্রবন্ধই আমাদের স্বাধীনতা পূর্ববর্তী সময়ের। তখন লেখাগুলো বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। অর্থাৎ ৬৭ থেকে ৭১ সালে প্রকাশিত। স্বাধীনতা পরবর্তী ১৯৭৩ সালে 'কালের যাত্রার ধ্বনি' সংকলিত গ্রন্থাকারে প্রথম প্রকাশিত হয়।

আমরা এবার প্রতিটি প্রবন্ধে দৃকপাত করি, আমি এখানে তাঁর প্রথম প্রবন্ধ 'জীবন জিজ্ঞাসার' কিছু উদ্ধৃতি তুলে ধরছি – "পৃথিবীতে আমাদের জীবন কাটাবার অধিকার একবার মাত্র। আর জীবনের সময় একবার চলে গেলে কোনো অবস্থাতেই তাকে আমরা ফিরে পাই না। এ জন্যই জীবন মূল্যবান, মূল্যবান এর প্রতিটি মুহূর্ত। বিগত দিনগুলোকে ফিরে পাওয়ার এবং অনন্তকাল বেঁচে থাকার সাধ মানুষের চিরন্তন।" আবার "মৃত্যুও মানুষকে ভাবিত করে। জীবনের অস্থায়িত্ব আর মৃত্যুর রহস্য ক্ষণে ক্ষণে মানুষকে আকুল চঞ্চল অস্থির করে। আর সৃষ্টির রহস্য জানার জন্যও মানুষের ব্যাকুলতা অন্তহীন।" তিনি বলছেন এটা সম্ভব। "মানুষ পারবে, মানুষ অনন্ত সম্ভাবনার অধিকারী। দুনিয়াটাকেই মানুষ স্বর্গে পরিণত করবে।"

'নতুন ও পুরাতন: প্রগতি ও প্রতিক্রিয়া' ১৯৬৭ সালে লেখা হয়। প্রবন্ধটিতে তিনি দ্বান্দ্বিকতার দৃষ্টিভঙ্গিতে নতুন ও পুরাতনের মধ্যেকার পার্থক্য ও নতুনের সম্ভাবনার বিষয়ে আশাবাদ ব্যক্ত করেছেন। তিনি বলেছেন– 'যুগে যুগে প্রত্যেক সমাজেই নতুন নতুন চিন্তাধারা দেখা দিয়েছে– ধর্ম বা মতবাদ গড়ে উঠেছে, আদর্শের উদ্ভব ঘটেছে, বিভিন্ন প্রকার জীবনপদ্ধতি ও সমাজব্যবস্থা রূপ লাভ করেছে। এবং তিনি সেই সময় পাকিস্তান বিরোধী সংগ্রামের তীব্রতার মধ্যে প্রত্যাশা করছিলেন–'উজ্জ্বল নতুন ভবিষ্যতের জন্য নতুন বিরোধ চাই, গুণগতভাবে নতুন বিরোধ– প্রগতি ও প্রতিক্রিয়ার বিরোধ। আজ অগ্রগতির নতুন পদ্ধতি চাই, গুণগতভাবে নতুন পদ্ধতি। আজ প্রগতির লক্ষ্যে নতুন সংগ্রাম চাই– সম্পূর্ণরূপে নতুন সংগ্রাম।' এই প্রবন্ধটির শেষ এখানেই।

'কালের যাত্রার ধ্বনি' প্রবন্ধটি লেখা হয় ১৯৬৭ সালে। এটি এই প্রবন্ধ সংকলনের সবচেয়ে বড় প্রবন্ধ। লেখাটির শুরু হয় কবি শামসুর রাহমানের একটি কবিতার চরণ দিয়ে– 'লিখিতে কহ যে দিনরাত্তির/ কাদের জন্য লিখব? কাদের জন্যে দুঃখের পাঠ/ করুণ ভাষ্যে শিখব?' এই লেখার মূল পাঠক কারা হবেন, কাদের উদ্দেশ্যে শিল্প-সাহিত্য ও সংস্কৃতি-রাজনীতির চর্চা হবে সেই প্রসঙ্গটিই তিনি পুরো প্রবন্ধ জুড়ে বিভিন্ন প্রসঙ্গ উত্থাপন করে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। নৈরাশ্যবাদী সাহিত্যকে তিনি প্রতিক্রিয়া পন্থার সাহিত্য হিসেবে দেখিয়েছেন। তিনি বলেছেন– "... পাঠকদের সামনে আর্টের বদলে এনটারটেইনমেন্টের সামগ্রী উপস্থাপন করা হল এবং তা দিয়ে সাহিত্য ও শিল্পকলার স্থান পূরণ করা হল– সেগুলোকেই আর্ট বলে চালিয়ে দেওয়া হল। অসৎ ব্যবসায়িক প্রতিযোগিতা, খ্যাতি অর্জনের হীনপন্থা, আনন্দ লাভের বিকৃত উপায় ও আত্মঘাতী আয়োজন সর্বত্র প্রাধান্য লাভ করল।"

লেখক ও পাঠকের পারস্পরিক দোষারোপ ও বিরূপ সমালোচনার বাস্তবতার পেছনে রাজনীতি যে মুখ্য ভূমিকা পালন করে সেটি তিনি এই প্রবন্ধে বিস্তৃত ব্যাখ্যায় তুলে এনেছেন। একেবারে পলাশী থেকে পূর্ববাংলার শাসক শ্রেণির উত্থান পতন, মধ্যবিত্ত শ্রেণির বিকাশ, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মাধ্যমে ইংরেজের অনুসারী সৃষ্টি, ইংরেজ প্রভুদের সাথে গাঁটছড়া বেঁধে আত্মস্বার্থে পূর্ববঙ্গের নতুন শাসক শ্রেণির বিকাশের চেষ্টা, পরবর্তীতে স্বাধীনতার প্রয়োজন অনুভব হলে স্বাধীনতা অর্জনের আশায় ইংরেজদের সাথে সখ্যতা বজায় রেখে চলা– সবই তিনি

উল্লেখ করেছেন। এবং সাম্প্রদায়িক সংঘাত সৃষ্টির পেছনে ইংরেজ শাসকদের বিরাট ভূমিকা ছিলো বলে তিনি মনে করেন। "তারা এই বিরোধকে ব্যবহার করেছিল নিজেদের শাসন ও শোষণের কাজে। দেশের হিন্দু-মুসলমান নেতারা ইংরেজদের বিভেদ-নীতির পাতা ফাঁদে পা দিয়ে দেশপ্রেমের বদলে সম্প্রদায়প্রেমের প্রমাণ দিয়েছেন।"

ইংরেজদের কাছ থেকে ক্ষমতা পেয়ে এদেশের শাসক শ্রেণি দুর্নীতির মাধ্যমে কিভাবে প্রভাব প্রতিপত্তিশালী হয় তার ব্যাখ্যা টেনেছেন। ইংরেজ বিরোধী আন্দোলনে বিপ্লববাদী ও প্রতিক্রিয়াশীল রাজনীতির ভিন্ন ভিন্ন উদ্দেশ্য এবং সেখানে বিপ্লববাদের ব্যর্থতাও উঠে এসেছে তাঁর আলোচনায়। তিনি প্রগতিবাদী লেখকদের উদ্দেশ্যে বলেন– "সমাজের উদীয়মান শক্তির জন্যই, অর্থাৎ শ্রমিক-কৃষক মধ্যবিত্তদের কল্যাণেই আমাদের সৃজনশীল লেখকদের লিখতে হবে। ... নতুন সাহিত্য তখনই হবে, যখন সে সাহিত্যে শ্রমিক-কৃষক মধ্যবিত্তের মুক্তির ও সমৃদ্ধ জীবনের আশা-আকাঙ্ক্ষা ও জীবনভাবনা রূপায়িত হবে– বিধৃত হবে তাদের জীবনের বাস্তাব ভিত্তি ও দ্বন্দ্ব-সংঘাতময় অন্তর্জীবন– তাদের মুক্তির আকাঙ্ক্ষা ও ভবিষ্যতের সম্ভাবনা।"

'প্রতিভাবানের প্রতীক্ষায়' প্রবন্ধটি লেখা হয় ১৯৬৮ সালে। জনসংগ্রামে বারবার হেরে যাওয়াদের মনে হয়, কোন অবতারের উদ্ভব হোক বা হবার প্রত্যাশা দানা বাঁধে। স্বাধীনতার পূর্ববর্তী সময়ে নেতৃত্বের সংকটের কারণে লেখকের এই উপলব্ধি কাজ করেছে আমরা ধরে নিতে পারি। যার জন্য তিনি এই প্রবন্ধ লেখার তাগিদ বোধ করেছেন। তিনি প্রবন্ধের শুরুতে চীনের সাহিত্যিক ল্যু সুনের উদ্ধৃতি দিয়েছেন। প্রবন্ধের শেষাংশে লেখক বলেছেন– "ভালো নেতৃত্ব আপনিতেই হবে না, ভালো নেতৃত্ব সকলের সচেতন চেষ্টা দ্বারা সৃষ্টি করতে হবে। ... 'নেতৃত্ব আসবে' এই ধারার চিন্তা ত্যাগ করে, 'আমরা নেতৃত্ব সৃষ্টি করব' এই ধারার চিন্তায় অগ্রসর হওয়া আমাদের কর্তব্য।"

'যুগান্তরের মুখে আমাদের সাহিত্য' এটি লেখা হয় ১৯৬৮ সালে। বৃটিশ উপনিবেশ থেকে পাকিস্তানের উদ্ভব যেমন এদেশের সাধারণ শ্রমিক কৃষক মধ্যবিত্তের মুক্তি দেয়নি, বিপরীতভাবে দেশীয় উত্থিত নতুন শাসক শ্রেণির ব্যাপক দুর্নীতি লুটপাট এবং ক্ষমতা চিরস্থায়ী করার অপরাজনীতি চলছে। তার প্রেক্ষিতে সাহিত্য ও সাহিত্যের ভূমিকাকে লেখক একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে বিবেচনা করেছেন।

লেখক প্রকৃতপক্ষে নজরুল, সুকান্ত, সুভাষ, মানিকের দ্বারা বাংলা সাহিত্যের যে ধারার সূচনা হয়েছিল পূর্ববাংলার সাহিত্যে সে ধারা মোটেই উৎকর্ষ অর্জন করেনি বলে মনে করেন। কল্লোল ধারার চর্চাকে তিনি কলা-কৌশলের নতুন পরীক্ষা-নিরীক্ষা থাকলেও অন্তরসম্পদের দিক দিয়ে সেগুলো দীন, এবং বহিরঙ্গে যৌবনের পরিচয় ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা

থাকলেও মর্মগত দিক দিয়ে বৃদ্ধ বয়সের বীর্যহীনতার পরিচয় বলেই মত ব্যক্ত করেন। ভাষা আন্দোলন পরবর্তী সময়ে লেখকরা পুরাতন মূল্যবোধকে যতটা অস্বীকার করেছেন, নতুনের অন্বেষণে ততটা অগ্রসর হননি বলে তিনি মনে করেন। এর পেছনে রাজনৈতিক ব্যর্থতাকে দায়ী করেন তিনি।

সবশেষে তিনি বলেন– 'আমাদের দেশে রাষ্ট্রীয় অন্যায়-অবিচার সামাজিক বিশৃঙ্খলা, অপব্যবস্থা ও আদর্শহীনতার ফলে মানুষ আজ এক রুদ্ধশ্বাস অবস্থার মধ্যে আছে। দেশের বর্তমান অবস্থার তুলনা হতে পারে একমাত্র অন্ধকার যুগের সঙ্গেই। এই সঙ্কটের হাত থেকে সমাজকে, মানুষকে মুক্ত করে সমৃদ্ধ জীবন ও সমাজ প্রতিষ্ঠার কাজে সাহিত্যিকেরা, চিন্তাবিদেরা আজ এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারেন।' এই আশাবাদ রেখেই তিনি প্রবন্ধটি শেষ করেন।

পরবর্তীতে আরো তিনটি প্রবন্ধ রয়েছে। তার মধ্যে '৬৯ এর লেখা 'পূর্ববাংলার সাহিত্য ও কণ্ঠস্বর'। 'সাংস্কৃতিক আন্দোলনের নবপর্যায়' ১৯৭০ সালে লেখা। '৬৯ এর গণঅভ্যুত্থানের পরে সাংস্কৃতিক আন্দোলনের যে নতুন সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়েছিলো তার প্রতিক্রিয়াতে এটি লেখা। শেষ প্রবন্ধটি হল 'পূর্ববাংলার সাংস্কৃতিক অঙ্গন'।

লেখক অধ্যাপক আবুল কাসেম ফজলুল হক যে বাস্তবতা ও দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে স্বাধীনতা পূর্ববর্তী সময়কে পর্যবেক্ষণ করেছেন, তাঁর বৌদ্ধিক উপলব্ধিতে যা প্রতিভাত হয়েছে, তিনি তা আন্তরিকভাবে বিশ্লেষণ করার প্রয়াস পেয়েছেন এই 'কালের যাত্রার ধ্বনি' প্রবন্ধের মাধ্যমে। যা সত্যিকারার্থে কালের যাত্রার ধ্বনি হিসেবে থেকে যাবে বুদ্ধিবৃত্তিক জ্ঞানচর্চার জায়গায়।

লেখক: চিত্রশিল্পী ও প্রাবন্ধিক

৬ আগস্ট ঢাকায় কল্যাণপুরে সুবর্ণা শিশু কল্যাণ হাইস্কুলে
English Story Reading ওয়ার্কশপ

পাবনার দেবোত্তর পাইলট বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ে মুক্তপাঠাগার বইমেলা

Shikkhalok
(a CDIP education bulletin)
13th year 3rd issue, August-September 2026

গৃহিণীদের আস্থা
BLOOM গুঁড়া মশলা

ডিলারশিপের জন্য যোগাযোগ
০১৩১৩০৩০৭৮১
ceo@cdipenterprise.com, sales@cdipenterprise.com